

# চেতনা

নভেম্বর সংখ্যা, ২০২১

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

# সূচি-

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের পত্রিকা **‘চেতনা’** নভেম্বর সংখ্যা, ২০২১।

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

**সম্পাদকমন্ডলী**- যুক্তিবাদীরা।

যোগাযোগ:
ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com
টেলিগ্রাম- @Yktibadira
ফেসবুক- যুক্তিবাদীরা–Rationalists

মূল্য- ত্রিশ টাকা
ওয়েবসাইট-
https://rationalists.wixsite.com/chetona

## সম্পাদকীয়

নভেম্বর সংখ্যা প্রকাশ করছি। ঘটনাক্রমে আজ বিশ্ববরেন্য বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। পাঠকেরা মতামত দিয়েছেন তা আমাদের ঋদ্ধ করেছে। পাশাপাশি আমাদের পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যই যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তকরা যাতে নিয়মিত লেখালেখির চর্চা ধরে রাখেন। যারা লেখালেখি করেন না তারাও অচলায়তন ভাঙতে কলম ধরুন, প্রকাশ করবে **‘চেতনা’**।

“.. প্রায় আঠারো বৎসর পূর্বেকার কথা। আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইয়াছে। ঢাকা শহরবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠিত এক উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি উৎসাহভরে তাহাকে আমার প্রথম জীবনের তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দু-এক মিনিট পরপরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, "এ আর নতুন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদ-এ আছে"। আমি দু একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম, 'মহাশয় এ সব তত্ত্ব বেদের কোন অংশে আছে তাহা অনুগ্রহ পূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি?' তিনি বলিলেন, "আমি তো ব্যাদ পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবি কর, তাহা সমস্তই 'ব্যাদে' আছে"।

বলা বাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসর ধরিয়া বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে।

অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচর্য একাদশ শতাব্দীতে অতিস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ নিউটন আর নতুন কি করিয়াছে? কিন্তু এই সমস্ত "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" শ্রেণীর তার্কিকগন ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচর্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে - একথা বলেন নাই। তিনি কোথাও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর এবং অপরাপর গ্রহের পরিভ্রমণপথ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোন হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপলার, গ্যালিলিও বা নিউটনের বহু পূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিস্কার করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছু নয়। ..."

-মেঘনাদ সাহা



# মানুষ বড় না ধর্ম বড়?

-জামাল আনসারী

সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের কুমিল্লায় একটি মন্দিরে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের অবমাননা করা হয়েছে বলে কি ঘটনায় না ঘটল। হাজার হাজার উন্মুক্ত উগ্রবাদী মানুষ কয়েকদিন ধরে ঢাকা, কুমিল্লা, ফেনি, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দির ও পূজামণ্ডপে হামলা চালাল, কয়েকটি গ্রামে অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা ঘটল,এমনকি দাঙ্গায় কয়েকজন নিরহী মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও পুলিশের সাথে সংঘর্ষের ঘটনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় একাধিক মামলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কথা তো ছেড়েই দিলাম কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন ছোট বড় মাঝারি নিউজ চ্যানেল এবং সংবাদপত্রের শিরোনামের কল্যানে গোটা বিশ্ববাসীর জানতে আর বাকি রইল না, যে কেন গোটা বাংলাদেশ জুড়ে এমন অভাবনীয় অনভিপ্রেত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

এই সব কান্ডকারখানা দেখে শুনে আপনার কি মনে হয় না যে, মানুষ বড় না ধর্ম বড়? একজন ধর্মান্ধ গোঁড়া আপাদমস্তক ধর্ম ব্যবসায়ী ব্যক্তির নিকট অবশ্যই তার নিজের ধর্ম বড়। কিন্তু যারা শিক্ষিত, প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, মানবদরদী, মানবতাবাদী, নাস্তিক, তারা কখনও ধর্মকে মানুষের উপরে স্থান দিতে পারে না।

মানুষ তার বুদ্ধিমত্তার জোরে প্রমান করেছে মানুষই এই পৃথিবীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ জীব। সেই মানুষই মাঝে মধ্যে উগ্র হয়ে ওঠে, প্রচন্ড হিংস্র হয়ে ওঠে। কারন মানুষ অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি।
আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে কবি বড়ু চণ্ডীদাস বলে গেছেন; মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক বাণী—
"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’।
মধ্যযুগে বসে বাংলারই এক কবি সমগ্র বিশ্বের জাতিকে শুনিয়েছেন বিশ্ব মানবতার অমর কবিতা। যেখানে কোনো ঈশ্বর-আল্লা-গড-ভগবান নয়, মানুষেরই স্থান সবথেকে উপরে। মানুষই বড়। মানুষের থেকে কোনো কিছুই বড় হতে পারে না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার সাম্যবাদী কবিতায় সব ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, এই ভাবে—"গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।"
নজরুল ছিলেন সব ধর্মীয় চেতনার ঊর্ধ্বে। অন্তরে তিনি না ছিলেন হিন্দু না ছিলেন মুসলিম। ‘তিনি সবার ঊর্ধ্বে ছিলেন মানবতার কবি। "জাতের বজ্জাতি" কবিতায় তিনি ধর্ম ব্যবসায়ীদের সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বলছেন—

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি – ভাবলি এতেই জাতির জান,

তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ’-খান।
এখন দেখিস ভারত জোড়া পঁচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া।

যে জাত-ধর্ম ঠুনকো এত, আজ নয় কা’ল ভাঙবে সে ত,
যাক্ না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া।"

নজরুলের স্পষ্ট উক্তি জাত, ধর্ম লুপ্ত হয়ে গেলেও এই পৃথিবীর মানুষের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। হাজার খানেক জাত, হাজার খানেক ধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কোনো দরকার নেই। ধর্ম ছাড়াও সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকা যায়। দুঃখের বিষয় হলেও একথা সত্যি যে, আমাদের দেশে নজরুল ইসলামের লেখার যথাযথ মূল্যায়ন এখনও পর্যন্ত হয়নি।

আমরা লেখাপড়া শিখি। বিদ্যা বুদ্ধি অর্জন করি। কিন্তু সেই অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগায় না। বিখ্যাত দার্শনিক ও রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"আমি ক্লাসে এত করিয়া ছাত্রদের পড়াইলাম, যে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপরে পড়িয়া চন্দ্রগ্রহণ হয়। তাহারা তা পড়িল, লিখিল, নম্বর পাইল, পাস করিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল যখন আবার সত্যি সত্যি চন্দ্রগ্রহণ হইল তখন চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছে বলিয়া তাহারা ঢাক, করতাল, শঙ্খ লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। ইহা এক আশ্চর্য ভারতবর্ষ।"

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উপলব্ধিতে কোনো ভুল ছিল না। আমরা ক্লাসে শিখি এক, আর প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করি আরেক। সেটাই হল বর্তমান শিক্ষিত যুব সমাজের অন্যতম দুর্বলতা। সেই দুর্বলতার সুযোগে ধর্মান্ধ উগ্রবাদ শুধু এপার বাংলা ওপার বাংলায় সীমাবদ্ধ নয়, গোটা বিশ্বের কোনায় কোনায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কবি কালিদাস তার কবিতায় মানুষেরই জয় ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার পরে করে দেবমহিমা নির্ভর। "কবি কালিদাস রায়ের উক্তিকে বর্তমানের শিক্ষা দীক্ষা, সভ্যতায় এগিয়ে থাকা মানুষজন বোধহয় কেউই অযৌক্তিক বলে এড়িয়ে যেতে পারবে না। এমন কি বড় বড় ধর্মগুরুরা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, কবির উক্ত বক্তব্য অতিরঞ্জিত নয়। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? হিংসার ঘটনাই বা ঘটছে কেন?

ধর্ম নিয়ে কেন এতো টানাটানি? ধর্ম নিয়ে মারামারি কাটাকাটি লড়াই ঝগড়ার অন্ত নেই। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সংঘর্ষে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার সিংহভাগ মৃত্যু হয়েছে ধর্মের কারনে। ধর্মকে যখনই মানুষের উপরের স্থানে বসানোর চেষ্টা হয়েছে তখনই বিশ্ব সাক্ষী থেকেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের। ধর্মের কারনে কত গ্রাম, কত নগর, কত জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'গোরা' উপন্যাসে ধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন—"একটা বিড়াল পাতের কাছে এসে ভাত খেলে কোনও দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃনা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কি বলব? মানুষকে

যারা এমন অবজ্ঞা করতে পারে, তারা কখনোই পৃথীবিতে বড়ো হতে পারে না। অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে।"

এই পৃথিবীতে এমন মানুষেই সংখ্যায় বেশি যারা ধর্মের নামে অধর্মের কাজই বেশি করে। সে জ্ঞাত ভাবেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ধর্মমোহ' নামক অবিস্মরণীয় একটি কবিতায় সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করে বলেছেন যে—"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে/ অন্ধ সে জন শুধু মারে আর মরে।"

রবি ঠাকুরের সেই অমর বাণীকে তোয়াক্কা না করে লক্ষ লক্ষ ধর্মান্ধ নিজের নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে মারামারি কাটাকাটি করে গোটা বিশ্বের শান্ত পরিবেশকে অশান্ত, বিষাক্ত করে তুলছে। কবে তারা বুঝবে মানুষের জীবনের চেয়ে ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ বড় হতে পারে না! কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের ''মানুষ' কবিতায় লিখে গেছেন—

"মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি' মরি!
ও' মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ' নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ'-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে,
পূজিছে গ্রন্থ' ভন্ডের দল! —মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ'; —গ্রন্থ' আনেনি মানুষ কোনো।"

পৃথিবীর সমগ্র মানুষ যেদিন বুঝতে পারবে কোনো ধর্ম নয়, ধর্ম থেকে মানুষ বড়। সেদিনই ধর্ম নিয়ে হানাহানি, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ইতি ঘটবে। সর্বকালের সেরা মানবদরদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় একটি উক্তি দিয়ে এই লেখা শেষ করছি— "সমস্ত ধর্মই মিথ্যা,—আদিম যুগের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।"

" কৃষকরা সংঘবদ্ধ হউন, তাহা না হইলে আপনাদের অধিকার দাবি স্বীকৃতি পাইবে না। ইহা ভাগ্যের পরিহাস যে যাঁহারা আমাদের খাদ্য উৎপাদন করেন, তাঁহাদিগকে খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর শিকার হইতে হয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কৃষকদের উচিত নিজেদের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট গড়িয়া তোলা।"

[১৯৩৭ সালের ২৮ শে অক্টোবর কিষানসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর পেশ করা ভাষণ]

# বিবেকানন্দ ও একটি বিভ্রান্তির জবাবে

-অভিষেক দে

বছরের পর বছর ধরে একটি মিথ্যেকে এমন ভাবে প্রচার করা হয়ে আসছে যেটাকে সত্য বলে ধরেই নিয়েছে আমজনতার একাংশ। মনোবিজ্ঞানে (Psychology) " Illusory Truth Effect " বলে একটা কথা আছে। এর মানে হচ্ছে একটি মিথ্যেকে ইচ্ছেকৃত ভাবে বারংবার বিকৃত করে জনগণের কাছে উপস্থাপন করলে জনগণ সেটাকেই সত্য বলে ধরে নেয়। এছাড়া অন্ধবিশ্বাসী, হুজুগ এবং গুজবপ্রিয় জনতা কোনওদিনই সত্যকে জানতে ভালো করে পড়াশোনা এবং পড়ে যাওয়া বিষয় নিয়ে আর দশজনের সাথে আলোচনা করে ঠিক ভুলটা বেছে নেন না।



গত ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ তে আনন্দবাজার পত্রিকার 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে উভয়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বিধান মুখোপাধ্যায় জাপানী কবি ওকাকুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ টেনে লিখেছেন, "ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছু পরামর্শ চাইলে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন - ভারতকে যদি জানতে চান, বিবেকানন্দকে জানুন। " If you want to know India, study Vivekananda. There is in him everything positive, nothing negative'."[১]

তথ্যসূত্র হিসেবে বিধানবাবু স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের উল্লেখ করেছিলেন। এইখানেই রহস্য।

“যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তাহলে বিবেকানন্দকে...” দীর্ঘবছর যাবৎ এটি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বলে কোটেশনটির প্রচার চলেছে। যতদূর জানা যাচ্ছে, কবিগুরুর নামে এই বক্তব্যটি প্রথমবার প্রকাশ পায় উদ্বোধন পত্রিকার ৪৩তম বর্ষের ভাদ্র ১৩৪৮ সংখ্যায়, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঠিক পরে। তাতে লেখা হয়েছিল, "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চরিতের জন্য রোমা রোলাঁ যখন উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন, সেই সময় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ সংঘের এক সন্ন্যাসীকে তাঁর ওই উক্তির কথা জানিয়েছিলেন।" উদ্বোধন পত্রিকারই আশ্বিন ১৩৯৩ সংখ্যায় স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তাঁর একটি প্রবন্ধের পাদটীকায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকালে লিখেছিলেন, "স্বামী অভয়ানন্দ বলেছেন, রোলাঁ নিজেই এই তথ্য একসময় স্বামী অশোকানন্দকে জানিয়েছিলেন।" স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ অবশ্য কোনও চিঠির উল্লেখ করেননি।

উদ্বোধন পত্রিকার আশ্বিন ১৩৯৫ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকার ৫৮১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখক জানিয়েছেন, "শোনা যায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর যখন প্রথম দেখা হয়, কবি তখন ঐ ফরাসী মনীষীকে বলেছিলেন : 'If you want to know India, study Vivekananda. In him there is nothing negative', everything positive.' দুঃখের বিষয় রোলাঁর ডায়রিতে উক্ত সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ আছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তির কোনও উল্লেখ নেই। রোমা রোলাঁ অথবা রবীন্দ্রনাথ কারও কোনও প্রকাশিত রচনায় ঐ উক্তিটি পাওয়া যায় না। এর পর লেখক ভাদ্র ১৩৪৮ এবং আশ্বিন ১৩৯৩ সংখ্যার প্রবন্ধ দুটির উল্লেখ করেছেন এবং অত্যন্ত আপশোসের সঙ্গে জানিয়েছেন, "দেখা যাচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের নির্ভর করতে হয় শ্রুতি আর স্মৃতির উপর।"

ইতিমধ্যে প্রখ্যাত রবীন্দ্র গবেষক অমিতাভ চৌধুরী ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'একত্রে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কবি ও সন্ন্যাসী' প্রবন্ধের ৩২০ পৃষ্ঠায় আমাদের জানালেন, "জাপানী মনীষী ওকাকুরা এসেছিলেন ভারতবর্ষকে বুঝতে, ভারতবর্ষকে জানতে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ চাইলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভারতবর্ষকে যদি জানতে চান, বিবেকানন্দকে জানুন' ; If you want to know India, study Vivekananda. There is in him everything positive, nothing negative." মজার বিষয়, এই উদ্ধৃতির কোনও তথ্যসূত্র কিন্তু অমিতাভ বাবু দেননি, এমনকি রোলাঁ যে কী করে পালটে ওকাকুরা হয়ে গেলেন, সে হদিসও তিনি আমাদের জানাননি। এটাই বড় রহস্যের।

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত যে নিবন্ধটির উল্লেখ করেছিলাম, তাতে আমরা দেখেছি লেখক ওখানেও ওকাকুরার নাম দিয়েছেন। এবার মজার কথা হল, তথ্যসূত্র হিসেবে লেখক যে বইটির উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' বইয়ের বাংলা অনুবাদের ৯৭৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো। তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছুই নেই।" এবং তথ্যসূত্র হিসেবে ৯৭৪-৯৭৫ পৃষ্ঠার ফুটনোটে উল্লিখিত আছে, "এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোঁমা রোঁলাকে বলেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী অশোকানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে রোঁমা রোঁলা এই তথ্যটি জানান। স্বামী অশোকানন্দের সূত্রে আমরা এই তথ্যটি জেনেছি।" জানিনা, আনন্দবাজার পত্রিকার উল্লিখিত প্রবন্ধের লেখক ওকাকুরার নাম কীভাবে পেলেন! মজার কথা হল, বিবেকানন্দ সম্পর্কে মিশনের সন্ন্যাসীরা এবং অসংখ্য বিবেকানন্দ বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু স্বামী অশোকানন্দকে লেখা রোঁমা রোঁলার ওই বিশেষ চিঠিটি আজ পর্যন্ত কেউ ছেপেছেন বলে খবর পাওয়া যায়নি।

আরও একটি মজার কথা হল, ভারতের অভিজ্ঞতা নিয়ে রোঁমা রোঁলা একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম 'ভারতবর্ষ দিনপঞ্জি : ১৯১৫-১৯৪৩'। অনুবাদক অবন্তীকুমার সান্যাল। প্রকাশকাল ১৯৬০। এরও ১৪ বছর আগে ১৯৪৬ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক থাকাকালীন সরোজ দত্ত অনুবাদ করেন রোমা রলাঁর পত্রপ্রবন্ধ 'I will not rest' এর। নাম দেন 'শিল্পীর নবজন্ম'। উভয় বইতেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ওই বহুচর্চিত বিশেষ মন্তব্যটি নেই। আমরা জানি, বিবেকানন্দের বেশ ভক্ত ছিলেন রোমা রোঁলা। ভারতবর্ষ দিনপঞ্জি বইটিতে

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। তাই অদ্ভুত লাগে রবীন্দ্রনাথের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য তিনি লিখতে ভুলে গেলেন কেন? হাইলি সাসপিসাস।

দেখা যাচ্ছে, একই উক্তি রবীন্দ্রনাথের নামে চালানো হয়েছে অথচ পাত্র আলাদা। এমনটাও হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ রোলাঁ ও ওকাকুরা দুজন বিদেশীকেই এই উপদেশ দিয়েছিলেন। ওকাকুরার ক্ষেত্রে পুরোটাই শ্রুতি হলেও রোলাঁর ক্ষেত্রে একটি তথাকথিত চিঠি বর্তমান। এখান থেকেই ভক্তির চশমাটা খুলে যদি আপনি যুক্তিসম্মত ইতিহাসচর্চা করতে বসেন তাহলে কি কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসা কি স্বাভাবিক নয়?

যেমন-

১- উদ্বোধন পত্রিকা ও চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ বইতে রোলাঁর নাম অথচ কবি ও সন্ন্যাসী বইতে ওকাকুরার নাম কেন? অর্থাৎ দুই ঘরাণার লেখকরা সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য দিয়েছেন কেন?

২- রোলাঁ সত্যিই যদি অশোকানন্দকে কোনও চিঠি লিখে রাখেন তাহলে সেই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি মিশন আজ অবধি প্রকাশ করেনি কেন?

৩- রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় মিশন কোনওদিন রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যটি তাদের পত্রিকায় ছাপেনি কেন?

৪- রবীন্দ্রনাথ আসলে কাকে কথাটা বলেছিলেন অথবা আদৌ কী বলেছিলেন?

৫- এখানেই সন্দেহ জাগে যে, পুরোটাই কি অপপ্রচার মাত্র? বিবেকানন্দকে জাস্টিফাই করতে কি একজন রবীন্দ্রনাথের মতো বড়ো নামের প্রয়োজন পড়েছিল?

পরিশেষে জানাই, যে কোনও চরিত্র বিশ্লেষণের আগে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে - আমরা কেউই শ্রেণীবদ্ধতা ও কালবদ্ধতার উর্ধ্বে নই। সমস্ত দোষমুক্ত মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। প্রতিটি চরিত্রকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করে দেখা প্রয়োজন তাঁদের দোষের পাল্লা ভারী, না গুণের। প্রিয় মুক্তমনা বন্ধুরা, রবীন্দ্রনাথের কোনও উক্তি ব্যবহার করার আগে সামান্য ভাববেন কিন্তু। যদিও এসব কারণে ওঁর মতন ব্যাক্তিত্বকে অসম্মান মোটেই জানানো উচিৎ নয়। কারণ আজ পর্যন্ত এমন প্রতিভাবান মানুষের কোনও সমকক্ষ কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কবিগুরুই বলেছিলেন - "তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে— রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" (এর সূত্র জানাবো না। আগ্রহী ব্যক্তিরা খুঁজে নেবেন)।

আবার দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন - “মনে রেখো, ঐ পরিবারটি (ঠাকুর পরিবার) বাংলাকে যৌনতার বিষে প্লাবিত করেছে।“ সূত্র- ভগিনী নিবেদিতার পত্রাবলী, ১ম খন্ড, ১৯৬০:৮২ (ইং সংকলন)।

স্বামী বিবেকানন্দকে সত্যিই জানতে এবং বুঝতে চাইলে দশ খন্ডের বাণী ও রচনা, পত্রাবলি, স্বামীজিকে যেরুপ দেখিয়াছি, স্বামী শিষ্য সংবাদ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, বিবেকানন্দ ও বাঙালির বিবেক,

সেকুলার বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ অন্য চোখে ইত্যাদি বইগুলো এবং কবিগুরুর ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী হতে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী, স্বরবিতান, গীতবিতান, গীতাঞ্জলী ইত্যাদি বইগুলো বেশ ভালো ভাবে এবং পাতায় পাতায় নিজের যুক্তিবোধ দিয়ে পড়া খুবই প্রয়োজন যদি না আপনি অন্ধভক্তদের দলে পড়েন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শিবাশীস বসু, সুনীত দে, শমীন্দ্র ঘোষ, সপ্তর্ষি রায়।

সূত্র[১]- https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/friendship-between-rabindranath-tagore-and-swami-vivekananda-1.1105588

আমাদের যুবকেরা অনেক সময় অল্পেই নিরাশ হইয়া পড়ে। সামান্য আঘাতেই নুইয়ে পড়ে, সহজেই সিদ্ধিলাভ করিতে চায়। কিন্তু জগতের যে সব মহৎ কার্য হইয়াছে, বৃহৎ আবিষ্কার হইয়াছে তাহার মূলে কত ত্যাগ, কত সাধনা, কত সুদীর্ঘকাল অধ্যবসায়, কত চিন্তা নিহিত রহিয়াছে।

- জগদীশচন্দ্র বসু



# পিতৃতন্ত্রে দাম্পত্য, আধিপত্য ও টক্সিক ব্যবহার - কিছু ভাবনা

-সম্রাট সেনগুপ্ত

কিছুদিন আগে একটা বাংলা ছবিতে দেখছিলাম কর্মব্যস্ত স্বামী বার বার ফোন ধরছেন বলে স্ত্রী ফোনটা আছড়ে দিল। অতঃপর স্বামী গেল দোকানে ক্রুদ্ধ স্ত্রীকে খুশি করতে শাড়ি কিনতে। রোজ অজস্র দাম্পত্য জোকস ভেসে আসে মোবাইলে যার মূল কথা হল, স্ত্রীরা কলহপ্রবণ এবং কলহ মেনে জীবন কাটানো সংসারে টিকে থাকার একমাত্র উপায়।

সে এক সময় ছিল কিছুকাল আগে যখন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর হেনস্থাকে স্বাভাবিক ধরে নেওয়া হত। ওটা ছিল ভালোবাসারই আরেক রূপ - প্রকাশ। স্বামী ছিল সেই যে গালি দেয়, মারে, আবার সোহাগও করে। নিজের জন একটু খবরদারী তো করবেই আর কি। নারী নির্যাতন ও গৃহ হিংসা নিয়ে আমাদের সচেতনতা সেই বোধকে অন্তত শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজে কিছুটা হলেও প্রশমিত করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু বারংবার বলে বলে যেন নারীর টক্সিক ব্যবহারকে, খবরদারী ও ঔদ্ধত্যকে স্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে। আসলে মূল পিতৃতান্ত্রিক পিতৃসুলভ নিয়ন্ত্রণের কাঠামোটি টিকেই থাকছে। নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো টিকে থাকলে যদি সেই নিয়ন্ত্রণ ও ঔদ্ধত্যের অধিকার নারীর কাছে যায় তবুও মূল আধিপত্যবাদী সিস্টেমটি টিকেই থাকে। অর্থাৎ নারী বা পুরুষের আদর্শ ব্যবহার ও যাপন কীরকম হবে তা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হতেই থাকে, সাথে চলে সম্পর্কের মধ্যে টক্সিক ব্যবহারকে স্বাভাবিক করে তোলার প্রক্রিয়া।

এমতবস্থায় কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন যে টক্সিক ব্যবহারে অভ্যস্ত পুরুষ বা নারী কি ভালোবাসেন না। অবশ্যই বাসেন। তাদের ভালোবাসার ধারণার সাথে আসলে নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রদর্শন যুক্ত। এক বিকৃত অধিকারবোধের পিতৃতান্ত্রিক ধারণা যেমন পুরুষকে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করেছে, তা নারীকেও একভাবে চালিত করে। সমাজকে বদলাতে গেলে desire কেও বদলাতে হবে, ভালোবাসার ধারণাকেও বদলাতে হবে।

অপরকে সম্মান দেওয়া এবং কাছের মানুষের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করা প্রতিটি মানুষের স্বীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সংসার তার ব্যতিক্রম নয়। আসলে বিবাহ আমাদের সনাতন ভাবনা বলে যে যত যাই বলুক না কেন বিবাহ একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই ভাবনা থেকেই একজন পার্টনার আরেকজনের ওপর টক্সিক ব্যবহার ছুঁড়ে দেন। কারণ বিচ্ছেদের ভয় নেই। বরং অন্যজন মেনে না নিলে তার মধ্যেই যেন একটা অপরাধবোধ কাজ করে। অর্থাৎ আপনার স্ত্রী আপনার মোবাইল ফোনটি আছড়ে ভাঙলে (তা সে যে কারণেই হোক না কেন)

আপনার পক্ষে তা মেনে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। বরং উলটে আপনি সেই রাগ প্রশমিত করার চেষ্টা করবেন আদর্শ স্বামী হিসেবে।

যে কোনও সামাজিক সম্পর্কে আমাদের অপর মানুষটি যেন ক্ষুব্ধ না হয় সেই চেষ্টা করে যেতে হয়। অফিসে, বাজারে, বন্ধুদের আড্ডায় আমাদের অন্য কারও ব্যবহার বা কাজ পছন্দ না হলেও নম্রভাবে তা ব্যক্ত করে বা তার ভিন্নতাকে সম্মান দিয়ে চুপ থাকি। এর কারণ সেখানে বিচ্ছেদের ভয় আছে। সোজা কথায় যার ওপরে আপনি খবরদারী করছেন, সে যদি আপনার ওপর নির্ভরশীল কর্মচারী না হন তা হলে সে আপনাকে এড়িয়ে চলবে, আপনার সামাজিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়বে।

অনেকে মনে করেন ব্যক্তিগত সম্পর্কে সেই সম্ভাবনা নেই। মা বাবা তাই ছেলেমেয়ের ওপর যথেচ্ছ খবরদারী করেন, নিজের ধারণা অনুসারে তার ব্যক্তিত্ব ও যাপনকে চালিত করতে চান। একই কাজ দাম্পত্যে একে অপরের ক্ষেত্রে করতে থাকে স্বামী অথবা স্ত্রী। সেখানে হারানোর ভয় নেই, আছে সীমাহীন অধিকারবোধ ও আধিপত্য। সেখানে মানিয়ে চলা মানে একে অপরের টক্সিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিজের নিজস্বতাকে প্রকাশ না করা, দমিয়ে রাখা। মানিয়ে চলা মানে কখনোই অপরের ভিন্নতা ও ব্যক্তিত্বকে মেনে নিয়ে ও সম্মান করে একসাথে থাকা হয়ে ওঠে না। এই ideology of possession আসলে কোনও এক সময়ের মালিকানার ধারণার সাথে যুক্ত, যখন স্ত্রী অন্যান্য সম্পদের মতোই স্বামীর সম্পত্তির অংশ হতেন। এখন তা আমাদের আবেগ অনুভূতির সাথে মিশে গেছে।

একটি পরিবারে সন্তান অপরের ভিন্নতাকে মর্যাদা দিতে শেখে না, শেখে না আপন ব্যক্তিত্বকে উদযাপন করতে। সে জানে বাবা মা তাকে যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, প্রয়োজনে বকা মারা করতে পারে তার ভালোর জন্যেই। ভবিষ্যতে তার সমস্ত সম্পর্কের ধারণাই এই আধিপত্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অপরের ভালোর কথা ভাবতে গেলে তাকে বুঝতে হয় ও বোঝাতে হয় কারণ সে ভিন্ন মানুষ। তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার আপনার নেই। ছেলেবেলা থেকে এই প্রচেষ্টার অভাব দেখে মানুষ সেটাকেই স্বাভাবিক মনে করে।

আমি তোমার ভালো তোমার চেয়েও বেশি বুঝি তাই তুমি আমার কথা শুনে চলবে - এই ভাবনা হল paternalistic ধারণা। সেখানে একজন আরেকজনের কাছে বোদ্ধা এবং ক্ষমতাবান পিতা হিসেবে আবির্ভুত হয়। পুর্নবয়স্ক মানুষকেও তার পার্টনার এভাবেই paternalize করে। অপরের নিয়ন্ত্রণ কখনোই বিশুদ্ধ হয় না। কারণ সেও মানুষ। তারও ইচ্ছা অনিচ্ছা লিপ্সা আকাঙ্খা ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি আছে। অধিক নিয়ন্ত্রণবাদী পিতারা তাই অচিরেই খবরদারীতে অভ্যস্ত হয়ে পরে। মেয়ের ভালোর জন্য যেমন তারা মেয়েকে সন্ধ্যের পর বেরোতে দেয় না বা তার পোষাক নিয়ন্ত্রণ করে তেমনই একদিন মেয়ে কার সাথে মিশবে, কাকে বিয়ে করবে সেগুলোও নিয়ন্ত্রণ করতে চায় পিতা। অতঃপর পিতা স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের মতো হয়ে ওঠে। তার ভালোর ধারণা সন্তান মানতে না চাইলে তার পিতৃত্বের ইগো আহত হয়। তখন - 'তুমি আমার কথার অবাধ্য হচ্ছ' - টাই

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন আর 'তোমার' ভালো নয়, জেগে ওঠে 'আমার' কথা, কারণ আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, তোমার জন্য এত কিছু করে থাকি।

একই ঘটনা দাম্পত্যে অভিনিত হতে থাকে। স্বামী তো বটেই স্ত্রীরাও এখন স্বামীকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তার ইচ্ছার বাইরে গেলে তাদের 'আমিত্ব' জেগে ওঠে। টক্সিক ব্যবহারকে তারা অধিকার মনে করে ও সেই অধিকারকে প্রশ্ন করলে তাতে ভালোবাসার অবমাননা হয়েছে মনে করে তারা। ইদানিং স্ত্রীর এই ভুমিকাকে গ্লোরিফাই না করা হলেও অন্তত স্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে। আমাদের মধ্যে যেটুকু লিঙ্গ

চেতনা তৈরি হয়েছে তাতে পুরুষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণকে, টক্সিক ব্যবহারকে সহজেই খারিজ করা চলে, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা তেমন সহজ হয় না। তাই সর্বত্র হাসিঠাট্টার ছলে অস্বাস্থ্যকর দাম্পত্যের ধারণা ছড়িয়ে পড়ে।

‘বিজ্ঞান প্রাচ্যেরও নয়, পাশ্চাত্যেরও নয়, ইহা বিশ্বজনীন।’

-জগদীশচন্দ্র বসু



# নাস্তিক-আস্তিক কথোপকথন

-আহমেদ তালট তাহজিব

নাস্তিক: স্রষ্টা কে?

ধার্মিক: যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই স্রষ্টা।

নাস্তিক: তিনি কী কী সৃষ্টি করেছেন?

ধার্মিক: সবকিছু।

নাস্তিক: সৃষ্টির আগে উনি কী করতেন?

ধার্মিক: সৃষ্টির আগে পরে বলে কোনও কথা নাই উনি সময়ের উর্দ্ধে।

নাস্তিক: তার মানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই ওঁর সৃষ্টি?

ধার্মিক: ঠিক ধরেছেন।

নাস্তিক: সবই যদি ওঁর সৃষ্টি হয় তাহলে আমার করণীয় কী?

ধার্মিক: আপনার করণীয় ওঁকে বিশ্বাস করতে হবে, ওঁর কথামতো চলতে হবে।

নাস্তিক: ওঁকে বিশ্বাস করা না করায় কি আসে যায় উনি তো আগে থেকেই ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে রেখেছেন?

ধার্মিক: তবুও আপনাকে আপনার কাজ করে যেতে হবে। কারণ আপনার কর্মফলের উপর ভিত্তি করেই উনি আপনাকে স্বর্গে অথবা নরকে দিবেন।

নাস্তিক: উনি যদি ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করেই থাকেন তাহলে আমার কর্মফল কিভাবে ওঁর সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনবে?

ধার্মিক: উনি আসলে আপনার জন্য ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে সেখানে অনেকগুলো ফলাফল দিয়ে রেখেছেন। আর আপনাকে জ্ঞান দিয়েছেন ভালো মন্দ বোঝার এবং ফ্রিউইল দিয়েছেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার। আপনার নেয়া সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে আপনি ওঁর সৃষ্টি থেকে কোন ফল পাবেন।

নাস্তিক: আচ্ছা উনি কি জানেন ওঁর সৃষ্টির অনেক ফলাফলের মধ্যে আমি কোনটা পাবো?

ধার্মিক: অবশ্যই উনি সব জানেন।

নাস্তিক: কীভাবে?

ধার্মিক: যেহেতু উনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান তাই উনি সব জানেন।

নাস্তিক: যেহেতু আমি নাস্তিক তাই ধরে নিলাম মরার পরে আমার অবস্থান হবে নরকে এবং উনি ভবিষৎ দেখেই তা জানতে পারলেন। এই জানাটা ধরে নিয়েই আজ থেকে আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস স্থাপন করলাম আর স্রষ্টার দেখানো পথে চলা শুরু করলাম। আমার এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলে আমি ভবিষ্যতে স্বর্গে চলে গেলাম। তাহলে কি ওঁর পূর্বের জানাটা ভুল হয়ে গেল না?

ধার্মিক: এটাও উনি আগে থেকেই জানতেন যে আপনি পরিবর্তন হবেন।

নাস্তিক: উনি আসলে কোনটা জানতেন আগেরটা নাকি পরেরটা?

ধার্মিক: পরেরটা।

নাস্তিক: তাহলে আগের জানাটা ভুল ছিল।

ধার্মিক: না উনি আগেরটাই জানতেন।

নাস্তিক: তাহলে ওঁর পরের জানাটা ভুল।

ধার্মিক: না না পরেরটাই ঠিক।

নাস্তিক: আপনার মাথামুণ্ড ঠিক আছে তো?

ধার্মিক: আগেরটাই ঠিক।

নাস্তিক: ঠিক আছে আজকের মত এখানেই থাক আপনি বাড়ি যান।

ধার্মিক: না না পরেরটাই ঠিক। না না আগেরটাই ঠিক। না না পরেরটাই ঠিক। কোনটা যেন ঠিক? ওহ আগেরটা। না না পরেরটা।

বি. দ্র: ধার্মিক এখন পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর কিছুক্ষণ পর পর বলতে থাকে -না না পরেরটাই ঠিক। না না আগেরটাই ঠিক...

**ধর্মের বিনাশ ছাড়া শোষণহীন সমাজের কল্পনা করা অবাস্তব এবং অসম্ভব।**

# আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, ঈশ্বর নেই?

-মারুফুর রহমান খান

ঈশ্বর বিশ্বাসীগণ যখন বুঝতে পারেন যে, তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারবেন না, তখন তারা অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

তারা এটা বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চেষ্টা করেন না যে, আমরা যদি 'ঈশ্বর নেই' প্রমাণ করতে না পারি, তাতে প্রমাণ হয় না 'ঈশ্বর আছে'। আমি একটি দাবি করে বসলাম, আপনি আমার দাবিটি মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলেন না, এতে আমার দাবিটি সত্য প্রমানিত হয়ে যায় না।

আমি যদি বলি অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির কোনও একটি নক্ষত্রের কোনও একটি গ্রহে ঠিক আপনার মতোই দেখতে একজন মানুষ বাস করে, স্বাভাবিকভাবেই আপনি আমার দাবিটি বিশ্বাস করবেন না, কেন না এমনটা বিশ্বাস করার কোনও যৌক্তিক কারণ আপনার কাছে নেই।

এখন, আপনি যদি আমাকে আমার দাবিটি সত্য প্রমাণ করে দেখাতে বলেন এবং আমি তাতে ব্যর্থ হয়ে আপনাকেই আবার আমার দাবিটি মিথ্যা প্রমাণ করে দেখাতে বলি আর আপনি যদি তা না পারেন, তাতে কি প্রমাণিত হয়? তাতে কি প্রমাণিত হয় অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির কোনও একটি নক্ষত্রের কোনও একটি গ্রহে ঠিক আপনার মতোই একজন মানুষ বাস করে? অবশ্যই না।

ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণের অভাবকে যদি আপনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা একটি লজিক্যাল ফ্যালাসি বা কুযুক্তি ছাড়া কিছু না। একে বলে Argument from ignorance fallacy.

এই Argument from ignorance fallacy বা অজ্ঞতার কুযুক্তি অনুযায়ী, কোনওকিছু সত্য, কারণ তা এখন অব্দি মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি, আবার, কোনওকিছু মিথ্যা, কারণ তা এখন অব্দি সত্য প্রমানিত হয়নি।

কোনও দাবি মিথ্যা প্রমাণিত না হলেই দাবিটি সত্য প্রমানিত হয়ে যায় না। আবার, কোনও দাবি সত্য প্রমানিত না হলেই দাবিটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায় না। এছাড়াও, আপনি যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলে দাবি করেন, তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ আপনাকেই দিতে হবে। দাবি যার, প্রমাণের দায়িত্ব তার।

আমি যদি শাঁকচুন্নির অস্বস্তি আছে দাবি করি, তাহলে শাঁকচুন্নির অস্বস্তি প্রমাণের দায়িত্ব আমার ওপরেই বর্তায়। নিজেই শাঁকচুন্নি বলে কিছু আছে দাবি করে অন্যকে 'পারলে শাঁকচুন্নি নেই প্রমাণ করে দেখাও' বলার

কোনো অর্থ নেই। কারণ, কেউ শাঁকচুন্নি বলে কিছু প্রমাণ করতে না পারলেই শাঁকচুন্নি বলে কিছু আছে প্রমাণিত হয়ে যায় না!

আপনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলে দাবি করলেন, আমি আপনার দাবির সপক্ষে প্রমাণ চাইলাম। আপনি বললেন, ঈশ্বর নেই তার প্রমাণ কী? আপনি এখানে Burden of proof fallacy প্রয়োগ করলেন।

কিছু দাবি করে দাবিটি প্রমাণ করার পরিবর্তে অন্যের ওপর অপ্রমাণের বোঝা চাপানোর মানেই Burden of proof fallacy.

বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্যে মানুষের দুর্বলতা লাঘব করা। দৈন এবং অভাব আসিয়া জীবনকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে। দেশের আর্থিক উন্নতি সাধক করিতে হইলে কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতি সাধন আবশ্যক। ইহা করিতে হইলে বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করিতেই হইবে।

-জগদীশচন্দ্র বসু

# মনু কে?

-অজিত কেশকম্বলী

সম্ভবত আপনারা অনেকেই মনুসংহিতার নাম শুনে থাকবেন। স্ত্রীদের প্রতি ঘৃণা, শূদ্রদের প্রতি অত্যাচার ও জাতিভেদের আকর গ্রন্থ এই মনুসংহিতা। সুচতর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সৃষ্ট এই শাস্ত্রে পদে পদে ব্রাহ্মণ্যবাদের জয়জয়কার দেখা যাবে, ব্রাহ্মণকে দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এই মনুসংহিতা। মনুসংহিতার প্রণেতা হিসাবে ঋষি মনুর নাম অত্যন্ত জনপ্রিয়। বৈদিক সাহিত্য হতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সর্বত্রই মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি, সেটি হল কয়েক'শ বছর আগেও নিম্নবর্ণের মানুষেরা এই মনুর বিধান অনুসারেই অত্যাচারিত হতেন, এখনও প্রায়ই দলিতদের উপর অত্যাচারের খবর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ অবধি মনুর আদর্শের ভুত হিন্দুদের পিছু ছাড়েনি।
বিখ্যাত লোকেদের পরিচয় যেমন জানার প্রয়োজন পড়ে, তেমনি কুখ্যাত লোকেদের পরিচয় না জেনেও উপায় থাকে না, মনুর ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য।

১/হিন্দুদের আদিমতম গ্রন্থ বেদে অসংখ্যবার মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

" হে অগ্নি! দেবগণ প্রথমে তোমাকে নহুষের মনুষ্যরূপধারী সেনাপতি করেছিলেন এবং ইহলোকে মনুর ধর্মোপদেষ্টা করেছিলেন। পুত্র যেন পিতৃতুল্য হয়।" (ঋগ্বেদ ১/৩১/১১)

"হে বিশুদ্ধ অগ্নি! হে অঙ্গীরা! মনু ও অঙ্গীরা এবং যযাতি ও অন্যান্য পূর্বপুরুষের ন্যায় তুমি সম্মুখবর্তী হয়ে (যজ্ঞ) দেশে গমন কর, দেবসমূহকে আন ও কুশের উপর উপবেশন করাও এবং অভিষ্ট হব্যদান কর।" (ঋগ্বেদ ১/৩১/১৭)

"হে অগ্নি! তুমি এ যজ্ঞে বসুদের, রুদ্রদের এবং আদিত্যদের অর্চনা কর এবং শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত ও জলসেচনকারী মনুজাত জনকেও অর্চনা কর।" (ঋগ্বেদ ১/৪৫/১)

"আমাদের নতুন স্তুতি হৃদয়জাত ও মিষ্ট জিহ্ব অগ্নির সম্মুখে ব্যপ্ত হোক; মনুর সন্তান মানুষগণ যথাকালে যজ্ঞ সম্পাদন করে ও যজ্ঞান্ন প্রদান করে সে অগ্নিকে সংগ্রামকালে উৎপন্ন করে। (ঋগ্বেদ" ১/৬০/৩)

"হে অগ্নি! তুমি মনুর অপত্যগণের মধ্যে দেবগণের আহ্বানকারী রূপে অবস্থিতি কর; তুমিই তাদের ধনের স্বামী, তারা স্বীয় শরীরে পুত্র উৎপাদনার্থ শক্তি ইচ্ছা করেছিল এবং মোহত্যাগ করে পুত্রগণের সাথে চিরকাল জীবিত থাকে।" (ঋগ্বেদ ১/৬৮/৪)

"দেবগণের আহ্বানকারী, অতিশয় বিদ্বান এবং দেবগণের মধ্যে মেধাবী অগ্নিদেব,মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদের যজ্ঞে উপবেশন করে দেবগণকে আমাদের হব্যের অভিমুখে শাস্ত্রানুসারে প্রেরণ করুন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও।" (ঋগ্বেদ ১/১০৫/১৪)

“আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান ও আজ্যাদিবিশিষ্ট নমোস্কারোপলক্ষিত স্তোত্র দ্বারা বহু হব্য বিশিষ্ট এবং দেবযজ্ঞে যজ্ঞসাধক অগ্নিকে পরিতোষপূর্বক সেবা করি। সে অগ্নি আমাদের হব্যরূপ অন্য গ্রহণের জন্য ক্ষমবান হয়ে নাশপ্রাপ্ত হবেন না। মাতরিশ্বা মনুর জন্য দূর হতে অগ্নিকে এনে দীপ্ত করেছিলেন, সেরূপ দূর হতে আমাদের যজ্ঞশালায় তিনি আসুন।“ (ঋগ্বেদ ১/১২৮/২)

“হে ইন্দ্র! তুমি সমুদ্রাভিমুখে যাবার জন্য নদীদের গমণশীল রথের ন্যায় অনায়াসে সৃজন করেছ। সংগ্রামকামীগণ যেরূপ রথ সৃজন করে সেরূপ তুমিও করেছ। মনুর জন্য ধেণুগণ যে সর্বার্থপ্রদ হয় এবং সমর্থ মানুষের জন্য ধেণুগণ যেরূপ ক্ষীরপ্রদ হয় সেরূপ অস্মদাভিমুখী নদী সকল একই প্রয়োজনে জল সংগ্রহ করে।“ (ঋগ্বেদ ১/১৩০/৫)

“স্বীয় তেজবলে শত্রুদের পরাভব করবার সময় হে অগ্নি! তুমি আমাদের সম্ভোগযোগ্য স্তুতি অবগত হও। তোমার আশ্রয় পেয়ে আমরা মনুর ন্যায় স্তব করি। সে অনুন মধুস্পর্শী ধনপ্রদ অগ্নিকে আমি জুহু ও স্তুতি দ্বারা আহ্বান করি।“ (ঋগ্বেদ ২/১০/৬)

হে মরুৎগণ ! তোমাদের যে নির্মল ঔষধ আছে, হে অভীষ্টবর্ষিগণ, তোমাদের যে ঔষধ অত্যন্ত সুখকর ও সুখপ্রদ, যে ঔষধ আমাদের পিতা মনু মনোনীত করেছিলেন, রুদ্রের সে সুখকর ভয়হারী ঔষধ আমরা কামনা করছি। (২.৩৩.১৩)।

(ঋগ্বেদ ৪/২৬/১) এ ইন্দ্র আপনার কীর্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-
“আমি মনু, আমি সূর্য, আমি মেধাবী কক্ষীবান ঋষি, আমি অর্জুনীর পুত্র কুৎস রিষিকে অলঙ্কৃত করেছি, আমি কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর।

“হে অগ্নি! মনুর ন্যায় আমরা তোমাকে ধ্যান ও প্রজ্বলিত করছি; হে অঙ্গীরা! তুমি মনুর ন্যায় যজমানের জন্য দেবগণের পূজা কর।“ (ঋগ্বেদ ৫/২১/১)

“মনুকৃত দেবযজ্ঞে তিনটি তেজের আবির্ভাব হয়; মরুৎগণ অন্তরিক্ষে সূর্য, বায়ু, অগ্নিরূপে তিনটি জ্যোতিষ্ক ধারণ করেন। হে ইন্দ্র! বিশুদ্ধ বলসম্পন্ন মরুৎগণ তোমার স্তব করেন, কারণ তুমি সুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং এ সকল মরুৎ দর্শন করে।“ (ঋগ্বেদ ৫/২৯/১)

“হে বন্ধুগণ! এস, আমরা সে স্তোত্র পাঠ করি, যা দিয়ে অপহৃত ধেণুগণের গোষ্ঠ উদ্ঘাটিত হয়েছিল, যা দিয়ে মনু বিশিশিপ্রকে জয় করেছিলেন যা দিয়ে বণিকের ন্যায় কক্ষীবান জলেচ্ছায় বনে গিয়ে জল লাভ করেছিল।“ (ঋগ্বেদ ৫/৪৫৬)

“হে মহান ইন্দ্র! মনুর ন্যায় কুশ বিস্তারকারী যজমানের অন্নের জন্য এবং সুখের জন্য যে যজ্ঞ আরদ্ধ হয়, অদ্য তোমাদের জন্য ক্ষিপ্র সে যজ্ঞ ঋত্বিকগণের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়েছে।“ (ঋগ্বেদ ৬/৬৮/১)

"হে অগ্নি! ঋত্বিকগণ দিবসে তিন বার হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য তোমার মধ্যে হব্য প্রক্ষেপ করে। মনুর ন্যায় এ যজ্ঞে দূত হয়ে যাগ কর এবং আমাদের শত্রু হতে রক্ষা কর।" (ঋগ্বেদ ৭/১১/৩)

"যজ্ঞার্হ দেবগণের ও যজনীয় মনুর, যজনীয় মরণরহিত সত্যজ্ঞ যে দেবগণ আছেন, তারা অদ্য আমাদের বহু কীর্তি যুক্ত পুত্র প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।" (ঋগ্বেদ ৭/৩৫/১৫)

"তুমি যজ্ঞশীল, কবিপুত্র,জাতবেদা,মনুর গৃহে উশবা তোমাকে হোতারূপে উপবেশন করিয়েছিলেন।" (ঋগ্বেদ ৮/২৩/১৭)

"হে বরুণ! আমরা মনুর ন্যায় সোম অভিষব করে ও অগ্নি সমিদ্ধ করে, ঘন ঘন হব্য স্থাপন ও বর্হি ছেদন করে তোমাদের আহ্বান করছি" (ঋগ্বেদ ৮/২৭/৭)

"সমান ক্রোধবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ মনুর উদ্দেশ্যে যুগপৎ দানে প্রবৃত্ত হোন, অদ্য এবং অপর দিনে এবং আমাদের পুত্রের জন্যেও ধনদাতা হোন।" (ঋগ্বেদ ৮/২৭/২০)

"হে শত্রু ভক্ষক, মনুর যজ্ঞারহ দেবগণ! তোমরা ত্রয়স্ত্রিংশ, তোমরা এ প্রকারে স্তুত হয়েছ।" (ঋগ্বেদ ৮/২৯/২)

"তোমরা আমাদের ত্রাণ কর,তোমরা রক্ষা কর, তোমরা আমাদের মিষ্ট কথা বল। হে দেবগণ! পিতা মনু হতে আগত পথ হতে আমাদের ভ্রষ্ট করো না, দূরবর্তী মার্গ হতেও ভ্রষ্ট করো না।" (ঋগ্বেদ ৮/২৯/৩)

"হে ইন্দ্র! বিবস্বান মনুর সোম পূর্বে যেরূপ পান করেছ, ত্রিতের মন যেরূপ যুগিয়েছ, আয়ুর সাথে যেরূপ প্রমত্ত হয়েছে,-" (ঋগ্বেদ ৮/৫২/১)

"যে স্থানে সকল স্তুতিবাক্য রচয়িতারা স্তব করবার জন্য মিলিত হয়, সোমের সে সত্য স্বরূপ স্থান আমরা যেন প্রাপ্ত হই। সে সোম যার জ্যোতি দ্বারা আলোক উদয় হয়ে দিবসের আবির্ভাব করেছে। যার জ্যোতি মনু রক্ষা করেছে এবং দস্যুর দিকে প্রেরিত হয়েছে।" (ঋগ্বেদ ৯/৯২/৫)

"যে সকল দেবতা অতি দূরদেশ হতে এসে মনুষ্যদের সাথে বন্ধুত্ব করেন, যারা বিবস্বানের পুত্র মনুর সন্তানদের অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের আশ্রয় দান করেন, যারা নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হন, তারা আমাদের মঙ্গল করুন।" (ঋগ্বেদ ১০/৬৩/১)

"মনু অগ্নি প্রজ্বলিত করে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সাতজন হোতা নিয়ে যে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে অতি উৎকৃষ্ট হোমের দ্রব্য উৎসর্গ করেছেন, সে সমস্ত দেবতাগণ আমাদের অভয় দান করুন এবং সুখী করুন, আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা করে দিন এবং কল্যাণ বিতরণ করুন।" (ঋগ্বেদ ১০/৬৩৬/৭)

ইন্দ্রের কীর্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বলা হচ্ছে-

“যজ্ঞানুষ্ঠানে নমুচিকে বধ করেছ। দাসজাতীয়কে ঋষির নিকট নিস্তেজ করে দিয়েছ। তুমি মনুকে সুবিস্তীর্ণ পথ সকল প্রস্তুত করে দিয়েছ, সেগুলি দেবলোকে যাবার অতি সরল পথ হয়েছে।“ (ঋগ্বেদ ১০/৭৩/৭)

“যেমন পূর্বকালে মনুর যজ্ঞে সোমরস এসেছিল, সেরূপ এ প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত সোম জলে প্রবেশ করুন। গাভীদের জলে স্নান করাবার সময়ে এবং গৃহ নির্মাণ কারযে এবং ঘোটকদের স্নান করাবার সময় যজ্ঞকালে এ অবিনাশী সোমরসদের আশ্রয় লওয়া হয়। “ (ঋগ্বেদ ১০/৭৭/৩)

ঋগ্বেদে মনুর বারংবার উল্লেখ দেখে মনুকে একজন প্রভাবশালী স্বতন্ত্র মানুষ বলেই মনে হয়।
২/এছাড়াও, তৈত্তিরীয় সংহিতায় মনুর নির্দেশকে ‘ভেষজ’ বলা হয়েছে- “যদ্বৈ কিং চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্।” ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে “সর্বজ্ঞানময়ো বেদঃ সর্ববেদময়ো মনুঃ” উক্তিটির মাধ্যমে মনুর মধ্যে সমস্ত বেদের জ্ঞান নিহিত আছে বলে প্রশংসা করা হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি বলছেন- “প্রজাপতি (ব্রহ্মা) মনুকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং মনুই প্রজাদের মধ্যে তা প্রচার করেন।”- “প্রজাপতি র্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ” (৩.১১.৪)।
তৈত্তিরিয় সংহিতায় মনু থেকেই প্রজা সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩/ রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখা যায়, রামচন্দ্রকর্তৃক আহত বানররাজ বালি রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করলে রামচন্দ্র মনুসংহিতা থেকে দুটো শ্লোক উদ্ধৃত করে নিজ দোষ ক্ষালনে উদ্যোগী হয়েছিলেন-“রাজভিঃ ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা।।শাননাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্ ।।” (১৮/৩১-৩২) অর্থাৎ, মানুষ পাপ করলে যদি রাজা তাকে দণ্ড দেন, তবে সে পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যবান ব্যক্তির ন্যায় স্বর্গে যায়; রাজার দ্বারা শাসিত হলে, অথবা বিচারের পর বিমুক্ত হলে, চোর চৌর্যপাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু রাজা চোরকে শাসন না করলে তিনি নিজেই ঐ চৌর্যপাপের দ্বারা লিপ্ত হন। রামায়ণে উদ্ধৃত এই শ্লোক দুটি মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ৩১৬ ও ৩১৮ সংখ্যক শ্লোকে প্রায় একইভাবে পাওয়া যায়।

কোশল দেশে বিখ্যাত অযোধ্যা নগরীর স্রষ্টা হিসাবে রামায়ণে ‘মানবশ্রেষ্ঠ মনু’-র নাম পাওয়া যায়।
“অযোধ্যা নাম তত্রাসিৎ নগরী লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ পুরের পরিনির্মাতা।। (বালকাণ্ড ৫/৬)

৪/ মহাভারতেও অসংখ্যবার মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে কখনো ‘স্বায়ংভুব মনু’ এবং কখনো বা ‘প্রাচেতস মনু’র উক্তি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৩৬.৩৮-৪৬) বর্ণিত হয়েছে-“পুরুষোত্তম ভগবান ধর্মবিষয়ক লক্ষ শ্লোক রচনা করেছিলেন, যার দ্বারা সমগ্র লোকসমাজের পালনীয় ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিলো (লোকতন্ত্রস্য কৃৎস্নস্য যস্মাদ্ ধর্মঃ প্রবর্ততে)। স্বায়ংভুব মনু নিজে ঐ ধর্মগুলি প্রচার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে উশনাঃ ও বৃহস্পতি মনু-

স্বায়ংভুবের গ্রন্থ আশ্রয় করে নিজ নিজ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন।–"স্বায়ংভুবেষু ধর্মেষু শাস্ত্রে চৌশনসে কৃতে। বৃহস্পতিমতে চৈব লোকেষু প্রতিচারিতে।।"

মহাভারতের শান্তি পর্বে রয়েছে,

"প্রজেনং স্বেষু দারেষু মার্দবং হ্রীরচাপলম।
এবং ধর্মং প্রধানেষ্টং মনু স্বায়ম্ভুবোহব্রবিং।।" (২১/১২)

অর্থাৎ, স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন- নিজ স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন, ম্রিদুতা, লজ্জা ও অচপলতা প্রভৃতি গুণগুলি অবলম্বন করাই হল শ্রেষ্ঠ ও অভিষ্ট ধর্ম।

রাজধর্ম বা রাজনীতিশাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে প্রাচেতস মনুর পরিচয়ও শান্তি পর্বে আছে-

"প্রাচেতসেন মনুনা শ্লৌকৌ চেমৌ উদাহৃতৌ।
রাজধর্মেষু রাজেন্দ্র তাবিহৈকমনাঃ শৃণু ।।" (৫৭/৪৩)

অর্থাৎ, মহাভারতের বনপরবে (৩৫/২১) মনুর দ্বারা মনুর দ্বারা রাজধর্ম বর্ণিত হওয়ার কথা এবং মনুর সৃষ্ট অর্থবিদ্যার প্রসঙ্গ দ্রোণপর্বে (৭/১) দেখা যায়।

৫/ গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন-

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্।বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ।।" (৪.১)
অর্থাৎ আমি ঐ যোগ পুরাকালে বিবস্বানকে বলেছিলেন এবং বিবস্বান নিজপুত্র বৈবস্বত মনুকে বলেছিলাম । পরে বৈবস্বত মনু ঐ যোগ ইক্ষাকুকে বলেছিল।

৬/ তাছাড়াও, ৮০০ থেকে ৮২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত টীকাকার বিশ্বরূপ তাঁর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকায় মনুসংহিতা থেকে দুশটিরও বেশি শ্লোকের পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন বলে P.V. Kane দেখিয়েছেন।

সপ্তম শতকে আবির্ভূত বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদের জনক শঙ্করাচার্য তাঁর বেদান্তসূত্রভাষ্যে প্রায়ই মনুসংহিতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়েছেন (উল্লেখ্য, বর্তমানকালের প্রচলিত হিন্দু দর্শন শঙ্কারাচার্যের এই মায়াবাদের উপরই আশ্রিত বলা যায়)।

২০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের নবম অঙ্কে মনুর একটি অনুশাসনের উল্লেখ রয়েছে এভাবে-

"অয়ং হি পাতকী বিপ্রো ন বধ্যো মনুরব্রবীৎ। রাষ্ট্রাদস্মাত্তু নির্বাস্যো বিভবৈরক্ষতৈঃ সহ।।" অর্থাৎ, মনুর মতানুসারে পাপাচারী ব্রাহ্মণ বধ্য হবেন না, বরং এঁকে এঁর সমস্ত ধন-সম্পদের সাথে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করাই বিধি।

মহাকবি কালিদাস তার রঘুবংশের প্রথম সর্গে দিলিপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন- এই রাজার শাসন প্রভাবে মনুর সময় থেকে প্রচলিত চিরাচরিত আচারপদ্ধতি থেকে তার প্রজারা বিচলিত হননি।

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদা মনো বর্ত্মনঃ পরম।

ন ব্যতিযুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তু র্নেমিবৃত্তয়ঃ" (রঘুবংশ ১/১৭)

আবার চতুর্দশ সর্গে (৬৭ শ্লোক) কালিদাস বলছেন – রাজা যাতে বর্ণ ও আশ্রম সুরক্ষিত করতে পারেন, তার জন্য মনু কিছু ধর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

"নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎস এব ধর্মো মনুনা প্রণীতঃ।"

আবার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও কয়েকবার মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

আরেক স্মৃতিশাস্ত্রকার বৃহস্পতির আবির্ভাবকাল ৫০০ খ্রিস্টাব্দের আগে। তিনিও প্রয়োজনবোধে বহুস্থানে মনুবচন উদ্ধৃত করেছেন। আবার অপরার্ক, কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতি ভাষ্যকারগণও নিজ নিজ মন্তব্যের সমর্থনে বৃহস্পতির ঐ উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করেছেন।

যেমন, কুল্লুক ভট্ট মনুসংহিতার প্রথম শ্লোকের টীকায় মনুবচনের প্রশংসাসূচক বৃহস্পতির দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে-"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং তু মনুস্মৃতৌ। মন্বর্থবিপরীতা যা স্মৃতিঃ সা ন প্রশস্যতে।।" বেদের অর্থ ঠিক ঠিক ভাবে উপস্থাপিত করার জন্যই মনুস্মৃতির প্রাধান্য। যে স্মৃতি মনুবচনের বিরুদ্ধ তা নিন্দনীয়। আবার-

"তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ। ধর্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে।।" তর্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র ততক্ষণ পর্যন্তই শোভা পায়, যতক্ষণ মনুস্মৃতি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকে। মনু হলেন ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষের উপদেষ্টা। বোঝা যাচ্ছে, মনুবচনই বেদবাক্য হিসেবে শিরোধার্য্য হয়ে আছে।

৭/ পুরাণে পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা কল্পনা করে সেই সেই দ্বীপে সাতটি জাতির পর্যায়ক্রমে বসতি স্থাপনের উল্লেখ দেখা যায়। এই সাতটি ছিল মূল জাতি। প্রত্যেক মূল জাতির আদি পিতা মনু; ফলে মোট সাতজন মনুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এঁরা হলেন- স্বায়ংভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। এঁদের মধ্যে বৈবস্বত মনুকে আর্যজাতির আদি পিতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। মনুসংহিতায় এই মনুর কথাই বলা হয়েছে ১/৬১-৬৩ শ্লোকে।

৮/বিভিন্ন শিলালেখ থেকে মনুর সম্বন্ধে জানা যায়।

৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে প্রচারিত কিছু অভিলেখে স্মৃতি শাস্ত্র রচয়িতা মনুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ এবং তার দ্বারা অভিহিত বিধানের উল্লেখ আছে।

৫৩৫ ও ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে বলভী থেকে প্রচারিত রাজা শ্রীধর সেনের অভিলেখে রাজাকে মনু ও অন্যান্যদের প্রণীত বিধি বিধান অনুসরণকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে- 'মন্বাদি-প্রণীতবিধিবিধান-ধর্মা'
৮ম শতক ও তার পরবর্তী বহু তাম্রলিপিতে 'উক্তঞ্চ মানবে ধর্মে', 'তত্র্য মনুগীতা ধর্মা শ্লোকা ভবন্তি' প্রভৃতি সূচনা দিয়ে শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৯/ অবশ্য মনুসংহিতা থেকেও মনু সম্বন্ধে জানা যায়।

মনুসংহিতা মতে, বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করে মনুকে সৃষ্টি করেছিলেন। মনুকে সমুদয় জগতের দ্বিতীয় স্রষ্টা বলা হয়েছে। ১/৩৩

মনু তপস্যার মাধ্যমে দশজন প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। তারা হল- মরীচি, অত্রি, অঙ্গীরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ট, ভৃগু ও নারদ। ১/৩৪-৩৫

মরীচি প্রভৃতি দশ প্রজাপতি আরও সাতজন মনুকে সৃষ্টি করেছিলেন। ১/৩৬ তাদের নাম হল স্বরোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, মহাতেজা, চাক্ষুস ও বৈবস্বত। ১/৬১-৬২ অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন এই সাতজন মনু নিজ নিজ অধিকার বলে এই চরাচর বিশ্বসংসার সৃষ্টি করে প্রতিপালন করেন। ১/৬৩

মনুসংহিতা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে,
মনুসংহিতায় বলা আছে, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে এই শাস্ত্র (মনুসংহিতা) প্রস্তুত করে যথাবিধি অধ্যয়ণ করিয়েছিলেন এবং মনু মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে পাঠ করিয়েছিলেন। ১/৫৮

মহর্ষি ভৃগু মনুর কাছে মনুসংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তিনিই মনুসংহিতা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। ১/৫৯

[লেখাটি সম্পূর্ণ করতে বিশেষভাবে ডাঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'মনুসংহিতা প্রাককথন' লেখাটির সাহায্য নিয়েছেন লেখক অজিত কেশকম্বলী ।]

# RSS একটি তীব্র নারী বিদ্বেষী সংগঠন

- সৌতিক দাস

'আরএসএস'-এর প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ডঃ হেডগেওয়ারের পরে এম এস গোলওয়ালকর 'আরএসএস'-এর পরিচালক হন। গোলওয়ালকর ১৯৪০ সালে এই দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত টানা ৩৩ বছর 'আরএসএস'-এর পরিচালক এর দায়িত্ব সামলেছিলেন।

ফ্ল্যাশব্যাক ১৯৬০, ডিসেম্বর ১৭; গুজরাট ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্ট-দের উদ্দেশে লেকচার দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পেলেন 'আরএসএস'-এর দ্বিতীয় সঙ্ঘচালক এম এস গোলওয়ালকর। সেখানে তিনি বলেন- "আজ ক্রস-ব্রিডিংয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেবল প্রাণীদের উপর করা হয়। কিন্তু মানুষের উপর এ জাতীয় পরীক্ষা করার সাহস আজকের তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞানীও দেখাননি। ...যে কোনও শ্রেণির বিবাহিত মহিলার প্রথম সন্তান অবশ্যই নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ দ্বারা জন্মগ্রহণ করা উচিত এবং তারপরে তিনি তার স্বামী দ্বারা সন্তানের জন্ম দিতে পারেন।"

পরবর্তীকালে 'আরএসএস'-এর মুখপত্র 'অর্গানাইজার' পত্রিকাতে ১৯৬১ সালের ২ জানুয়ারী ৫ নম্বর পৃষ্ঠাতে এই খবরটি ছাপা হয়েছিল।

অর্থাৎ ওঁর ওই বক্তব্যের সারমর্ম করলে এই দাঁড়ায় যে, আপনি যদি মহিলা হন আর কোনও সন্তানের মা হতে চান তবে আপনার স্বামীর বদলে নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কোনও পুরুষের সাথে আপনাকে সেক্স করতে হবে যতদিন পর্যন্ত না আপনি প্রেগন্যান্ট হচ্ছেন। তারপর সেই পুরুষের ঔরসজাত সন্তান আপনার গর্ভে আসার পর দ্বিতীয় সন্তান আপনি আপনার স্বামীর সাথে সেক্স করে নিতে পারেন।

ফ্ল্যাশব্যাক ২০১৩, জানুয়ারি ৬ ; 'আরএসএস'-এর প্রধান শ্রী মোহন ভাগবত ইন্দোরের একটি জনসভা থেকে বলে উঠলেন- "বিবাহ হল চুক্তি। ছেলেরা বিবাহ করে সুখ পাওয়ার জন্যে, আর মেয়েরা বিয়ে করে ছেলেদের সুখ দেওয়ার বিনিময়ে নিজেদের পেট চালানোর জন্য। এই চুক্তি মেয়েরা যদি পূরণ করতে না পারে তাহলে পুরুষদের ওদের ছেড়ে দেওয়া উচিত।"

'আরএসএস'-এর দ্বিতীয় সঙ্ঘ-চালক গোলওয়ালকার তাঁর 'বাঞ্চ অফ থটস' বইয়ে ২৩৮ পৃষ্ঠায় গণপরিষদকে তুলোধোনা করে ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছিলেন, জাতীয় লক্ষ্য, জীবন দর্শনের কোনও পথনির্দেশই সংবিধানে নেই, কোনও নিজস্বতাও নেই, কারণ গণ পরিষদের পণ্ডিতরা 'মনুস্মৃতি'র মত প্রাচীন ভারতের নৈতিক ও কার্যকরী আইনকে সংবিধানে জায়গা দেওয়ার প্রয়োজন বোধই করেননি।

বাবাসাহেব আম্বেদকর রচিত ভারতীয় সংবিধানের বদলে 'আরএসএস' সেই 'মনুস্মৃতি'কে ভারতের সংবিধান হিসেবে চেয়েছিলো যে, 'মনুস্মৃতি'র প্রতিটি পদে পদে নারী জাতির প্রতি চূড়ান্ত অসম্মানের, নারী বিদ্বেষের ইতিহাস লেখা আছে।

১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর বাবাসাহেব ড. ভীমরাও আম্বেদকরের নেতৃত্বে 'মনুস্মৃতি' পুড়িয়ে দিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনা আরও বেশি বেশি করে প্রমাণ করে, এই বইটির ছত্রে ছত্রে আছে শুধুই বিদ্বেষের সুর।

'মনুস্মৃতি'তে মোট দু'হাজার সাতশো শ্লোক ও ১২ টি অধ্যায় আছে। এই মনুশাস্ত্রে কোথাও নারীকে শূদ্রের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নারীকে স্বভাবজাত দাসী বানিয়েই রাখা হয়েছে।

মনুশাস্ত্রে নারী হচ্ছে, পুরুষের ইচ্ছাধীন এক যন্ত্র যাতে পুরুষপ্রভু তার বীর্যরূপ বীজ বপন করে পুত্ররূপ শস্য হিসেবে যোগ্য উত্তরাধিকারী উৎপাদনের মাধ্যমে ধর্মরূপ পুরুষতন্ত্রের বহমান ধারাটিকে সচল রাখতে পারবে। এখানে নারী কেবলই এক পুরুষোপভোগ্য জৈবসত্তা। নারীর মনস্তত্ত্ব বা কোনওরূপ মানসিক সত্তাকে মনুশাস্ত্রে স্বীকারই করা হয়নি। নারীর দেহসত্তাটিরই প্রাধান্য এখানে, যার মালিকানাও নারীর নিজের নয় অবশ্যই। এর মালিকানা শুধুই আধিপত্যকামী পুরুষ প্রভুর। পুরুষতন্ত্র তার ইচ্ছানুরূপ শারীরিক-মানসিক ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করতে পারবে।

'মনুস্মৃতি'র ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থাকা এই নারী বিদ্বেষের কথার সাথে গোলওয়ালকর, মোহন ভাগবতদের সুর মিলে যাচ্ছে তো!

সেই কারণেই সেদিন 'আরএসএস', বাবাসাহেব আম্বেদকর রচিত ভারতীয় সংবিধানের বদলে এই 'মনুস্মৃতি'কে ভারতের সংবিধান হিসেবে চেয়েছিল।

আমি আমার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে সারাজীবন এদের বিরোধীতা করে যাব। আমার আশেপাশের সাধারণ মানুষকে এভাবেই বার বার বুঝিয়ে যাব যে, 'আরএসএস' শুধু একটি দেশদ্রোহীদের সংগঠন না তার সাথে একটি তীব্র নারী বিদ্বেষী সংগঠনও।

সবাইকে ভালোবাসা যায় না, কাউকে কাউকে ঘৃণা করতেও জানতে হয়। আমি আমার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে এদেরকে ঘৃণা করতাম, ঘৃণা করি আর আজীবন করে যাব।

কথা দিলাম আপনিও যেদিন 'আরএসএসে'র পুরো ইতিহাস পড়ে ফেলবেন, জেনে ফেলবেন, বিশ্বাস করুন ঠিক সেদিন আপনিও ঘৃণাতে বমি করে ফেলবেন।
ওয়াক থুঃ!

# লোক ঠকানোর ধান্দাবাজি: বাটি চালানোর মূল রহস্য!

-এস এ খান

বাটি চালানোতেই যদি কাজ হতো তবে পুলিশ, গোয়েন্দা, সি বি আই, সি আই ডি, “ডগ স্কোয়াড” না রেখে “বাটি চালানো স্কোয়াড” রাখা হতো! এর কোনও বৈজ্ঞানিক কৌশল নেই’ই এমনকি এমন ঘটার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই। যেটা আছে সেটা হল ভাঁওতাবাজি এবং “সফল বাটি চালানোর” কেস স্টাডিতে পাওয়া যায় “অভ্যন্তরীণ রাজনীতি” আর অপরাধীকে আড়াল করে কোনও "সজ্জন ব্যক্তিকে ফাঁসানোর" মারপ্যাঁচ ।

প্রথমেই তথাকথিত “বাটি চালনো” পদ্ধতিটা জেনে নেওয়া যাক, যেটার কথা বলা হয়ে থাকে :

১. তান্ত্রিক সাধু লোক তার তন্ত্র-মন্ত্র পড়ে বা আগে থেকে “পড়ে রাখা” বাটি রাখবে মাটিতে।

২. তথাকথিত “তুলা রাশির জাতক”কে সেটা হাত দিয়ে ধরতে হবে, কেউ কেউ বাটিতে হাত রাখতে বলে, কখনও হাতে লাঠি নিয়ে লাঠির মুক্তপ্রান্ত বাটির মধ্যে রাখতে বলা হয়।

৩. বাটি চলা শুরু করে ও কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে চলে যায় ধরে রাখা ব্যক্তিটাকে নিয়ে।

প্রথমেই পরিষ্কার মনে রাখা প্রয়োজন, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম লঙ্ঘন করে বাটির নিজে নিজে চলা সম্ভব নয়।

কোনও বস্তুকে স্থির অবস্থা থেকে নাড়াতে চাইলে আপনাকে এর ওপর বল প্রয়োগ করতে হবে। বাটির ওপর যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন; বাটি যদি লৌহজাতীয় ধাতুর তৈরি হয় সেক্ষেত্রে চৌম্বক শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন; এমনকি রাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যবহার করেও শক্তি উৎপন্ন করে কাজে লাগানো যায়। ধান্দাবাজদের বাটি চালানোর ক্ষেত্রে আসি। ইশারায় যদি কোনও বস্তুকে নাড়ানো হয়- তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ইশারা থেকে উৎপন্ন শক্তি বাটিকে নাড়াচ্ছে। এই ব্যাপারটি যদি সত্যি ঘটে থাকে, তাহলে তা এসব ছোটখাট কাজে ব্যবহার না করে বড় কাজে ব্যবহার করা যায়।

যেমন, যেসব ওঝা /তান্ত্রিক /বাবা ইশারায় বাটি নাড়ান তারা একত্র হয়ে একটি পরিবহন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এই সংস্থা কোনও জ্বালানি বা শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই বস্তু সরানোর কাজ করে দেবে। এতে পৃথিবীর জ্বালানি সমস্যা মিটে যাবে। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসও খুঁজতে হবে না। মহাকাশে যান পাঠাতে আর জ্বালানি লাগবে না, তাদের ইশারার মিলিত শক্তি সেগুলোকে অরবিটে পাঠিয়ে দেবে। বাস, ট্রাক, প্লেনে এইসব লোককে নিয়োগ করা যায়। তাদের ইশারা থেকে প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহার করে যানবাহন চলবে। পৃথিবীর শক্তি বিষয়ক যাবতীয় সমস্যা মিটে যাবে। পৃথিবী হয়ে উঠবে শক্তি আত্মনির্ভর!

যাই হোক, আসল কথা বলি- বাটি চালান দিয়ে কখনোই ইশারার মাধ্যমে বাটি নাড়ানো সম্ভব না। তা সম্ভব হলে পদার্থবিদ্যা সূত্রগুলো নতুন করে লিখতে হবে, আর এরা পাবেন নোবেল পুরস্কার। এই জাতীয়

ঘটনাগুলোয় সবসময়ই কোনও না কোনও কৌশল ব্যবহার করা হয়। ঠিক যেমন যাদুকরেরা তাদের কৌশল ব্যবহার করে আমাদের চোখে ধুলো দেয়। আর ওঝা / তান্ত্রিক/ হুজুর / বাবাদের হাত থেকে যদি নিজের আত্মীয়পরিজনকে বাঁচাতে চান তাহলে তাদেরকে হয়- পদার্থবিজ্ঞান শেখাতে পারেন, নয়তো স্রেফ বলতে পারেন যে, ধর্মে যাদুবিদ্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি নিশ্চিত, এটা কাজ করবে!

এখন আসি ঘটনা বিশ্লেষণে। সে ক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি দুটো বিষয়:
১. এধরনের ঘটনায় বহুবার বাটি না নড়ার এবং বহুবার কাঙ্ক্ষিত স্থানে না পৌঁছাবার ঘটনা ঘটে এবং প্রায়শই যাদের পরিবারে বাটি চালান পদ্ধতি প্রয়োগের ঘটনা ঘটে থাকে তাদের ফলাফল না পাবার ঘটনা জানা থাকবার কথা। (তারপরেও আস্থা কীভাবে থাকে সেটা বোধগম্য নয়)

২. তান্ত্রিক/বাবা/ওঝা ব্যক্তি পইপই করে বলতে থাকে "আমার উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে সবার, আমার তন্ত্রের উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে সবার, নয়ত চালান কাজ করবে না।" এটা হল সেইফ জোনে যাওয়ার সেরা উপায়। কাজ না করলেই বলে ফেলা যায়। আপনাদের মধ্যে কেউ হয়ত আমাকে, আমার তন্ত্রকে বিশ্বাস করেননি। তাই হয়নি।

এবার দেখা যাক কী ঘটে?
যখন তান্ত্রিক নিজেই "তুলা রাশির জাতক" সাপ্লায়ার তখন বলাই বাহুল্য সাপ্লায়ার নিজেই বাটি চালনার চালিকা শক্তির উৎস এবং নিজেই ঠেলে নিয়ে যায়। সম্ভাব্য কোনও স্থানে। মিলে গেলে কাকতালীয় বাহবা, আর না মিললে উপরে ২ নম্বর পয়েন্ট হড়বড় করে বলে দেওয়া।
যখন পরিবারের কেউ বা বাইরের কোনও ভলান্টিয়ারকে বাটিতে হাত রাখতে বলা হত তখন দুটো ঘটনা ঘটতে পারে।
১. যদি ভলান্টিয়ার নিজে বেশ গভীরভাবে মনে করে "বাটি চালান" কাজ করেই তবে সে হাত রাখার পরে অজান্তেই তার মনে হয় বাটি নড়ছে। এতে সে নিজেও ওইদিকে হাত নাড়ায় ফলে বাটি এগোতে থাকে। আর একবারে এগিয়ে গেলে সেটা আরও পেয়ে বসে ও কোনও একটা জায়গায় গিয়ে থামে। ভলান্টিয়ার বুঝতেও পারে না সে নিজেই নিয়ে যাচ্ছে বাটি। তার মনে হয় বাটিই তাকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা সম্পূর্ণই মানসিকে চাপ ও সাব-কনশাস মাইন্ডের খেলা।



২. শুরুতে যে রাজনীতির কথা বলেছিলাম এখন সেটাই বলছি। এটা আমার নিজের ছোট সময়ের একটা ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। ওদিনই বুঝে গিয়েছিলাম, বাটি চালান "বড়দের একটা পাতানো খেলা" মাত্র।

সচরাচর যদি খুব দামী কিছু খোয়া যায় যেমন, স্বর্ণালংকার বা বড় অংকের টাকা বা ধরুন, এখন দামী মোবাইল এবং ধারণা করা হয় চুরি হয়ে বাইরে যায়নি তাহলে সেটা খুঁজতে "বাটি চালান" পদ্ধতি এখনও অনেকে অবলম্বন করে।
এক্ষেত্রে যদি অপরাধী সেখানে থেকেই থাকে এবং পরিবারে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কেউ হয় এবং সেও মনেপ্রাণে ধরে নেয় "বাটি চালান দিলে তো আমি ধরা পড়েছি"।

তাহলে সম্মান বাঁচাতে যে ঘটনাটা ঘটে –
সে বাঁচতে স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেয়, সবার সামনে ধরা পড়লে মান-সম্মান যাবে এই ভয়ে। তখন সে এমন কাউকে বলে যে তাকে মারবে না। তখন সে তেমনই একজন মুরুব্বির/মোড়ল/পাড়ার দাদার হাতে পায়ে ধরে নাকের জল চোখের জল এক করে মাফ চায় এবং জিনিস ফেরত দেয়।
মুরুব্বি/মোড়ল তাকে ও পরিবারের সম্মান বাঁচাতে বাড়ির কোনও অন্ধকার ঘুপচিতে জিনিসটা লুকিয়ে রাখে। ঘরের "তুলা রাশির জাতক"কে সাইডে নিয়ে সেট আপ দেয়, পুরা ঘটনাটা বুঝিয়ে দেয় কীভাবে কী করতে হবে মানরক্ষার্থে। যথাসময়ে সেই সেট আপ হওয়া তুলা রাশির জাতক বাটি সেই মুরুব্বির/মোড়লের পূর্ব লুকানো স্থানে নিয়ে যায়। জিনিস পাওয়া যায়, অপরাধী উলালা উলালা আর এইদিকে তান্ত্রিক রকস।
এটাই হচ্ছে বেশিরভাগ সফল বাটি চালানের "অভ্যন্তরীণ রাজনীতি"।

এছাড়াও কাউকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতে বা অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে তার সম্পত্তি দখল নিতেও অনেকে তান্ত্রিক / ওঝার সঙ্গে জোট বাঁধে। আখের গুছোয়।

**ভারতীয় সংবিধানের ৫১ এ ধারা অনুযায়ী, বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার ও প্রসার করা এবং অনুসন্ধানী মনন তৈরি করা দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য।**

# বইয়ের পাতার গন্ধ

-দেবব্রত দাস

একেক মানুষ এই গন্ধটিকে একেকভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কারো কাছে এটি শুধুই পুরনো কাগজের গন্ধ। কারও কাছে এই গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে পুরনো স্মৃতি। কিন্তু বিজ্ঞান কী বলে? এই সুগন্ধের পেছনে রয়েছে শত শত জৈবিক উদ্বায়ী (volatile organic compound, VOC) পদার্থ। বইয়ের কাগজ, কালি, আঠা সবকিছুর মাঝে থাকে এসব উদ্বায়ী পদার্থ | সময়ের সাথে সাথে এসব রাসায়নিক ভাংতে থাকে আর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষ সেই গন্ধ | নতুন বইয়ের মাঝেও কিন্তু এক ধরণের গন্ধ থাকে। বই কেনার পর এর পাতায় নাক ডুবিয়ে দেখতে পারেন। কিন্তু তার সাথে পুরনো বইয়ের গন্ধের বিস্তর ফারাক।

বই তৈরিতে যদি ব্যবহৃত হয় বেনজালডিহাইড, তবে তার সুগন্ধটা হবে অনেকটা কাঠবাদামের মতো, ভ্যানিলিন ব্যবহার করলে হবে তানিলার মতো। মিষ্টি গন্ধ আসে টলুইন এবং ইথাইল বেনজিন থেকে, আর ২-ইথাইল হেক্সানল থেকে আসে ফুলের সুবাস। সময়ের সাথে সাথে এই যৌগগুলির সাথে অক্সিডেশন -এর ফলে এই রকম উদ্বায়ী গন্ধ তৈরি হয়।

নিছক জানার জন্য জানা নয়, কী কারণে বইয়ের গন্ধ অন্যরকম হয় তা জেনে রাখার পেছনে কিন্তু উপকারিতাও আছে। গন্ধ থেকে বোঝা যেতে পারে, পুরনো বইটি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবার কোনও ভয় আছে কিনা। একটি গবেষণায় জানা যায়, এমন ১৫টি VOC আছে যাদের কারণে খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

## পুরানো বই এর পাতা হলুদ হয়ে যায় কেন?

পুরানো বই এর পাতা হলুদ হওয়ার কারন হল, লিগনিন ও সেলুলোজ অনু ভাঙনের ফলে। কাগজ সাধারনত লিগনিন ও সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। সেলুলোজের কাজ হল পাতার মধ্যে থাকা লিগনিন তন্তুকে ধরে রাখা। সময়ের সাথে সাথে কাগজের লিগনিন অক্সিজেন -এর সংস্পর্শে এসে বিক্রিয়া করে অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। এই অ্যাসিড সেলুলোজকে ভেঙ্গে ফেলে যার দ্বারা বইয়ের পাতা হলুদ হয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে এই অ্যাসিডের হাইড্রলাইসিস বিক্রিয়া হয় এবং বিভিন্ন উদ্বায়ী জৈব যৌগ সৃষ্টি হয় যা পুরাতন বইতে গন্ধের সৃষ্টি করে।।

# গুরুপ্রসাদী প্রথাঃ হিন্দুসমাজে নববধূ যখন গুরুদেবের প্রসাদ

- বিশ্ব ব্যাপারী

হিন্দু সমাজে একসময় এক ধরণের রীতি প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুসারে বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করার আগেই গুরুদেবের কাছে নিজের স্ত্রীকে নিবেদন করতে হত। গুরুর খাওয়া হয়ে গেলে তার প্রসাদ পেত শিষ্য, তাই এই প্রথার নাম হল গুরুপ্রসাদী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখা কালিপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা' বইয়ে এই প্রথার মোটামুটি ভালো বিবরণ মেলে। কালিপ্রসন্ন তার বইয়ে গুরুপ্রসাদী প্রথার এরকম বিবরণ দিয়েছেন -

পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবতন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল। নতুন বিয়ে হলে গুরুসেবা না করে স্বামী-সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন। চক্রবর্তীর ছেলেপুলে কিছুই ছিল না, কেবল ছিল একটি মাত্র কন্যা। শহরের ব্রকভানু চক্রবর্তীর ছেলে হরহরি চক্রবর্তীর সাথে তার বিয়ে হয়।বিয়ের সময় বর কনের বয়স ১০/৫ বছরের বেশি ছিল না। সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া কী মেয়ে আনা কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল। কেবল পাল পার্বণে, পিঠে সংক্রান্তি ও ষষ্ঠীর বাটায় তত্ত্ব তাবাস চলতো।

যখন বরের বয়স প্রায় কুড়ি-একুশ হল তখন তার শ্বশুরমশাই তাকে নিয়ে গেলেন। শহুরে জামাইকে দেখার জন্য গ্রামের নানা দিক থেকে লোক আসতে লাগলো, সে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। এমন সময় মেয়ের বাড়ির লোকেদের মনে পড়লো গুরুপ্রসাদী প্রথার কথা। তাই পঞ্জিকাতে ভালো একটি দিন দেখে গোঁসাইগুরুকে খবর পাঠানো হল। গোঁসাইও খোল করতাল নিয়ে তার দলবলের সাথে আগমন করলেন।

হরহরি গুরুপ্রসাদীর ব্যাপারে ব্যাপারে তেমন কিছু জানতেন না। কিন্তু তার স্ত্রীকে নতুন কাপড়, আর প্রচুর গয়না পড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে এবং শ্বশুরবাড়ির সবাইকে ভীষণ ব্যতিব্যস্ত দেখে তার মনে সন্দেহ হল। তিনি এক ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, " কিহে, আজকে বাড়িতে কিসের এত আয়োজন?" ছেলেটি বললো, " জামাইবাবু, তুমি জানো না, আজ আমাদের গুরুপ্রসাদী হবে। "

গুরুপ্রসাদীর কথা শুনে বর হরহরি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কীভাবে এই গুরুপ্রসাদী হতে তার স্ত্রীকে রক্ষা করা যায় তিনি তার উপায় ভাবতে লাগলেন। আর এর মধ্যে গোঁসাই বরের মত সেজেগুজে জামাইবাবুর ঘরে গিয়ে শুলেন। এরপর গুরুপ্রসাদীর জন্য হরহরিবাবুর স্ত্রী নানারকমের অলঙ্কার পড়ে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

হরহরিও গোঁসাইয়ের ঘরে ঢোকার আগেই বুদ্ধি করে একটি লাঠি নিয়ে খাটের নিচে লুকিয়ে ছিলেন। হরহরি দেখলেন, তার স্ত্রী গোঁসাইকে প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। প্রভু অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে মেয়েটিকে বিছানায় নিয়ে গেলেন। আর মেয়েটিও বা কি করে, 'বংশপরম্পরানুগত ধর্ম না মানা মহাপাপ'- এমন ধারণা তার মনে গেঁথে ছিল। তাই সেও আপত্তি করলো না। এবার গুরুদেব মেয়েটিকে স্পর্শ করে মেয়েটিকে বলতে বললেন, "আমি রাধা তুমি কৃষ্ণ"। মেয়েটিও গুরুদেবের কথামতো বললো,""আমি রাধা তুমি কৃষ্ণ"। মেয়েটি সবে তিনবার বলেছে, "আমি রাধা তুমি কৃষ্ণ" হরহরি বাবু আর থাকতে পারলেন না। খাটের নিচ থেকে উঠে এসে গুরুদেবের চরম ধোলাই করলেন। ধোলাই খেয়ে গুরুদেব সজোরে চিৎকার করতে থাকেন। গুরুপ্রসাদী করতে যাওয়ার আগে গুরুদেব তার শিষ্যদের বলে এসেছিলেন প্রসাদী সেড়ে উনি 'হরিবোল' বললে সবাই যেন খোল করতাল বাজায়। এখন গোঁসাইয়ের আর্তনাদকে 'হরিবোল' ভেবে শিষ্যরা খোল করতাল বাজাতে শুরু করলো, বাড়ির মেয়েরা উলু দিতে লাগলো। সবকিছুর শব্দে চারপাশে হুলস্থূল পড়ে গেল।

হরহরিবাবু দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। তাকে দেখে সবাই অবাক। সকলে ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে অচেতন, আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। আর হরহরি সোজা থানায় গেলেন।

"সেই থেকে গুরুপ্রসাদী প্রথা বন্ধ হয়ে গেল, লোকের চৈতন্য হল, গুরুদেবরাও ভয় পেল।"

এ বার আরেকটি কাহিনী বলা যাক। গুরুপ্রসাদী প্রথার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই, তবে গোঁসাইদের লীলাখেলার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে।

একবার এক বাড়ির পুরুষেরা বাড়িতে ছিলেন না। এমন সময় গোঁসাই সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। প্রভুকে সমাদর করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। বাড়ির সকল মেয়েরা একজায়গায় হলে গোঁসাই চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবত অনুসারে বেছে বেছে গোছালো গোছালো লীলা করতে শুরু করলেন। লীলা সেরে গোঁসাই বাড়ি ফিরছেন এমন সময় সেই বাড়ির ছোটোবাবুর সাথে তার দেখা। ছোটোবাবু একটু মেজাজি লোক। প্রভুকে দেখেই তার মাথা গরম হয়ে গেল। তিনি প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ভাগবতের মতে লীলা দেখানো কি শেষ হল?" প্রভু ভয়ে ভয়ে আমতা আমতা করতে লাগলেন – "আজ্ঞে, ইয়ে... মানে... বলছিলাম কী" ছোটোবাবুর একজন মোসায়েব ছিল। সে এর মাঝে বলে উঠলো, " হুজুর! গোঁসাই সকল রকমের লীলা করে চললেন, কিন্তু গোবর্ধন পর্বতটাতো ধারণ করলেন না? আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে গোঁসাইকে গোবর্ধন পর্বতটাও ধারণ করানো যেত!" একথা শুনে ছোটোবাবু মাথা নাড়িয়ে বললেন, " হুম, একদম ঠিক বলেছ। গোঁসাই এত লীলা করলেন, এটাও বা বাকি থাকবে কেন? যাও ওনাকে গোবর্ধন ধারণ করাও।" ছোটোবাবুর আদেশে দশ বারো মনের একটি পাথর গোঁসাই -এর ঘাড়ে চাপানো হল। পাথরের ভারে গোস্বামীর কোমর গেল ভেঙ্গে। এরপর থেকে প্রভুরা আর এই ধরণের জায়গায় লীলা করতে যেতেন না। প্রয়োজন হলে শিষ্যারা পালকি চড়ে গুরুদেবের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন।

তথ্যসূত্রঃ এই দুটি কাহিনীই কালিপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা' বই থেকে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্টা ৬০ এর পর থেকে পাবেন)।

কবিতা:

# বিদ্রোহের দিন

-ঋতম সানা

বাতাসে ভাসছে আজ দেখি মুক্তির সুবাস
ভেঙে সকল বিভেদের শেকল, উঠছে গড়ে মানববন্ধন
জীবনের পঙক্তি যারা লিখবে নতুন করে
ছুয়েও যেতে পারে রামধনু আকা ঐ মুক্ত গগণ

যেই শোষকের শেষকথা ওদের নিকট ভাগ্যের পরিহাস
শুরু থেকে শেষ তাদেরই কব্জায় যখন বদ্ধ জীবন
মৌনতার ব্রত ভেঙে আজকে দেখি নিদ্রাহীন সব চোখ
প্রতিবাদের উন্মাদ সুরে নেচে উঠেছে দেখি সকল মন কেমন

আজ দূর থেকে দেখি পরিবর্তনের পদধ্বনী
একত্রিত সকল অস্তিত্বের নতুন করে লড়াইয়ে নামা
মিছিল স্লোগান প্রতিরোধের আহবান চারিপাশে
রণহুংকারী ঐ লাল চোখ, ভাঙা চোয়াল, শীর্ণ কলেবর, কীভাবে দিচ্ছে হানা
মানবে না বাধা, হাটাও সকল মন ভোলানো কথা
জ্বেলে স্পর্ধার মশাল, ছিড়ে গোলামির দড়ি
এগিয়ে আসে সংকল্প, ফেলে সকল বাহানা

রোজ রোজ দেখি ভাঙছে জীর্ণ সংস্কার
দুর্লভ রুটি অন্নও আজ দু'হাতে মেটাচ্ছে আহার
আজ চকিত ঐ সিংহাসন, ছিন্নভিন্ন রাজশাসন
কোথায় বড়বাবুদের সাহসী ভাষণ
আজ গুটিয়েছে পাত্তারি শোষনের কারবার

আজ নাকি বিদ্রোহের দিন, চলছে মহোতসব ক্লান্তিবিহীন
সকল ব্যর্থতা ভুলে এই সমাজের প্রকৃত মানে, আজ নতুন ছন্দে আসীন
জড়োসড়ো প্রথা, মিথ্যা রীতিনীতি ভুলে সকল নবীন
আজ মেটাবে বঞ্চিত সকল জঠরের ঋণ

চলে যাবো দেখে শেষ পরিণতি, এই শেষ রজনীর
শুনি বিদ্রোহীদের মহাভাষ্য, দেখি বিকৃত সভ্যতা ধ্বংসের কাহিনী
আমি দেখি এবার বদলের ইতিহাসে,
উঠবে নতুন ভোরের শপথে রাঙা সূর্য আগামীর

তখন প্রতিটা দিন শিশুদিবস প্রতিটা অসহায় শিশুর জন্য
ক্ষুধা, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, দারিদ্রের মহামারী মুক্ত
সকল মাতৃক্রোড় হতে তখন, এক নতুন সভ্যতা নেবে জন্ম

দধীচির ন্যায় যে গরিবগুলোর জ্বলেছিল হাড়
আজ এই নতুন সমাজের শেকড়ে সাড়, ওদেরই ছাইভস্ম
শোনা যাবে শব্দ সকল ক্ষমতাধারীর আত্মসমর্পণ অতন্দ্র,
ঝোকাবে মাথা এদের সামনেই এই বিছিন্ন বিশ্বসমগ্র



# আড়ি

-প্রদীপ চক্রবর্তী

কৃষকের লাঙ্গল-কাস্তে,
শ্রমিকের হাতুড়ি।
রাজমিস্ত্রিরির হাতের কলায়
গড়ে ওঠে ঘরবাড়ি।

আমরা বসে মৌজ করি,
পাওনা গন্ডার হিসাব।
সভ্যতার মুখে ছড়াই,
অসভ্যতার তেজাব।

ওরা কাজ করে নগর প্রান্তরে,
আমরা খাচ্ছি মাখন,
চুনকালির দাগ তুলব বলে
মুখে ঘষছি বেসন।

সর্বহারা ঘোরায় চাকা,
আমরা চড়ি গাড়ি।
ভগবানের দোহাই দিয়ে
যুক্তির সঙ্গে আড়ি।

# পলাতক তুফান

(বৈজ্ঞানিক রহস্য)

-আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

**প্রথম পরিচ্ছেদ**

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক অত্যাশ্চর্য্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং এ বিষয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় অনেক লেখালেখি চলিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮ এ সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার ইংরাজী সংবাদপত্রে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয়—

সিমলা, হাওয়া আফিস ২৭এ সেপ্টেম্বর। "বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।"

২৯এ তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল—হাওয়া আফিস আলিপুর। "দুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ড-হারবারে এই মর্ম্মে নিশান উত্থিত করা হইয়াছে।"

৩০এ তারিখে যে খবর প্রকাশিত হইল তাহা অতি ভীতিজনক—

"আধঘন্টার মধ্যে চাপমান যন্ত্র দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। আগামী কল্য ১০ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে; এরূপ তুফান বহু বৎসরের মধ্যে হয় নাই।"

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই। আগামীকল্য কি হইবে তাহার জন্য সকলে ভীত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১লা অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তার পর দিন হাওয়া আপিস খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—

কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।"

ঝড় কোন্ দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্-দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর সর্ব্বপ্রধান ইংরাজী কাগজ লিখিলেন—এত-দিনে বুঝা গেল যে, বিজ্ঞান সর্ব্বৈব মিথ্যা।

অন্য কাগজে লেখা হইল, যদি তাহাই হয় তবে গরীব টেক্সদাতাদিগকে পীড়ন করিয়া হাওয়া আফিসের ন্যায় অকর্ম্মণ্য আফিস রাখিয়া লাভ কি?

তখন বিবিধ সংবাদপত্র তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—উঠাইয়া দাও।

গবর্ণমেন্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে হাওয়া আফিসের জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার আনান হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙ্গা শিশি বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর হাওয়া আফিসের বড় সাহেবকে কি কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে?

গবর্ণমেন্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে লিখিয়া পাঠাইলেন- "আমরা ইচ্ছা করি ভেষজবিদ্যার এক নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বায়ুর চাপের সহিত মানুষের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধ বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।"

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ লিখিয়া পাঠাইলেন—"উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই তবে কলিকাতাবাসীরা আপাততঃ বহুবিধ চাপের নীচে আছে:—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম | বায়ু | প্রতি বর্গইঞ্চি | ১৫ | পাউণ্ড | |
| ২য় | ম্যালেরিয়া | ,, | ২০ | ,, | |
| ৩য় | পেটেন্ট ঔষধ | ,, | ৩০ | ,, | |
| ৪র্থ | ইউনিভার্সিটি | ,, | ৫০ | ,, | |
| ৫ম | ইন্‌কম ট্যাক্স | ,, | ৮০ | ,, | |
| ৬ষ্ঠ | মিউনিসিপাল ট্যাক্স | ,, | ১ | টন। | |

বায়ুর ২/১ ইঞ্চি চাপের ইতর বৃদ্ধি 'বোঝার উপর শাকের আঁটি' স্বরূপ হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই নূতন অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে বিশেষ যে উপকার হইবে এরূপ বোধ হয় না।

তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।"

ইহার পর গভর্ণমেন্ট নিরুত্তর হইলেন। হাওয়া আফিস এবারকার মত অব্যাহতি পাইল। কিন্তু যে সমস্যা লইয়া এত গোল হইল তাহা পূরণ হইল না।

একবার কোন বৈজ্ঞানিক বিলাতের 'নেচার' কাগজে লিখিয়াছিলেন বটে; তাঁহার থিয়োরী এই যে, কোন অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে আবর্ত্তমান বায়ুরাশি ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। অক্সফোর্ডে যে ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এক অতি বিখ্যাত জার্ম্মাণ অধ্যাপক "পলাতক তুফান" সম্বন্ধে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধারম্ভে অধ্যাপক বলিলেন, তুফান বায়ুমণ্ডলের আবর্ত্তমাত্র। সর্ব্বাগ্রে দেখা যাউক, কিরূপে বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী যখন ফুটন্ত ধাতুপিণ্ডরূপে সূর্য্য হইতে ছুটিয়া আসিল তখন বায়ুর উৎপত্তি হয় নাই। কী করিয়া অম্লজান, দ্ব্যম্লজান ও উদ্‌জানের উৎপত্তি হইল তাহা সৃষ্টির এক গভীর প্রহেলিকা! যবক্ষারজানের উৎপত্তি আরও বিস্ময়কর। ধরিয়া লওয়া যাউক, কোন প্রকারে বায়ুরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। গুরুতর সমস্যা এই যে, কি কারণে বায়ু শূন্যে মিলাইয়া যায় না। ইহার মূল কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশী কিম্বা কম। যাহা গুরু তাহার উপরেই টান বেশী এবং তাহা সেই পরিমাণে আবদ্ধ। হাল্কা জিনিষের উপর টান কম, তাহা অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত। এই কারণে তৈল ও জল মিশ্রিত করিলে লঘু তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। উদ্‌জান হাল্কা গ্যাস বলিয়া অনেক পরিমাণে উন্মুক্ত এবং উপরে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু

মাধ্যাকর্ষণের টান একেবারে এড়াইতে পারে না। আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বর্ণিত হইল তাহা যে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে প্রযুজ্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; কারণ ইণ্ডিয়া নামক দেশে যদিও পুরুষজাতি গুরু তথাপি তাহারা উন্মুক্ত, আর লঘু স্ত্রীজাতিই সে দেশে আবদ্ধ!

সে যাহা হউক, পদার্থমাত্রেই মাধ্যাকর্ষণবলে ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকে। পদার্থের মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র কথা। মানুষ মরিয়া যখন ভূত হয় তখন তাহার উপর পৃথিবীর আর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। কেহ কেহ বলেন, মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই; কারণ ভূতদিগকেও থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির আজ্ঞানুসারে চলাফেরা করিতে হয়। পদার্থও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—পদার্থ সম্বন্ধে পঞ্চত্ব কথা প্রয়োগ করা ভুল; কারণ রেডিয়ামের গুতা খাইয়া পদার্থ ত্রিত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আলফা, বিটা ও গামা এই তিন ভূতে পরিণত হয়। এইরূপে পদার্থের অস্তিত্ব যখন লোপ হয় তখন অপদার্থ শূন্যে মিলিয়া যায়। কিন্তু যতদিন পার্থিব পদার্থ জীবিত থাকে ততদিন পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে না।

যদিও অধ্যাপক মহাশয়, পদার্থ কেন পলায়ন করে না, এ সম্বন্ধে অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলেন, তথাপি তুফান কেন পলায়ন করিল, এ সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে—সে আমি।

পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**

গত বৎসর আমার বিষম জ্বর হইয়াছিল। প্রায় মাসেক কাল শয্যাগত ছিলাম।

ডাক্তার বলিলেন—সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে লঙ্কাদ্বীপ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?” আমার কন্যা ভূগোল-তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল “দ্বীপ”—ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরল-কেশ মসৃণ মস্তকে দুই এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল, “তোমার ব্যাগে এক শিশি ‘কুন্তল-কেশরী’ দিয়াছি; জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দুই একটি দ্বীপের চিহ্নও থাকিবে না।” ‘কুন্তল-কেশরী’র আবিষ্কার এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। সার্কাস দেখাইবার জন্য বিলাত হইতে এদেশে এক ইংরেজ আসিয়াছিল। সেই সার্কাসে কৃষ্ণ কেশর-ভূষিত সিংহই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য দৃশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজে আসিবার সময় আণুবীক্ষণিক কীটের দংশনে সমস্ত কেশরগুলি খসিয়া যায় এবং এদেশে পৌঁছিবার পর সিংহ এবং লোমহীন কুকুরের বিশেষ পার্থক্য রহিল না। নিরুপায় হইয়া সার্কাসের অধ্যক্ষ এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইল এবং পদধূলি লইয়া জোড়হস্তে বর প্রার্থনা করিল। একে ম্লেচ্ছ, তাহাতে সাহেব! ভক্তের বিনয় ব্যবহারে সন্ন্যাসী একেবারে মুগ্ধ হইলেন এবং বরস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ অবধৌতিক তৈল দান করিলেন। পরে উক্ত তৈল ‘কুন্তল-কেশরী’ নামে জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছে। তৈল প্রলেপে এক সপ্তাহের মধ্যেই সিংহের লুপ্ত কেশর জাগিয়া উঠিল। কেশহীন মানব এবং তস্য ভার্য্যার পক্ষে উক্ত

তৈলের শক্তি অমোঘ লোকহিতার্থেই এই শুভ সংবাদ দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমন কি, অতি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম পৃষ্ঠায় এই অদ্ভুত আবিষ্কার বিঘোষিত হইয়া থাকে।

২৮এ তারিখে আমি চুসান জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দুইদিন ভালরূপেই গেল। ১লা তারিখ প্রত্যুষে সমুদ্র এক অস্বভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইল। সমুদ্রের জল পর্য্যন্ত সীসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, “যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহু দূরে—এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।”

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্ধকার হইল এবং দূর হইতে এক এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তারপর মুহূর্ত্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে। কোথা হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্ম্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।

বায়ুর গর্জ্জনের সহিত সমুদ্র স্বীয় মহাগর্জ্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিল। তারপর অনন্ত ঊর্ম্মিরাশি, একের উপর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহা ঊর্ম্মি জাহাজের উপর পতিত হইল এবং মাস্তুল, লাইফ-বোট ভাঙ্গিয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে জীবনের স্মৃতি যেরূপ জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এই সময়ে তাহা পর্য্যন্ত স্মরণ হইল— “বাবা, এক শিশি ‘কুন্তল-কেশরী’ তোমার ব্যাগে দিয়াছি।”

হঠাৎ এক কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে, এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে তৈলের শিশি খুলিয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল। উপরে উঠিয়া দেখি, সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্ব্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা ঊর্ম্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি ‘জীব আশা পরিহরি’ সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া ‘কুন্তল-কেশরী’ বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া শিশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; মুহূর্ত্ত মধ্যে তৈল সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই এবং এই কারণেই সেই ঘোর ব্যাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের সাহায্যে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

**ধর্মের কাজ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা; তাই এক ধার্মিকের রক্তে সব সময়ই গোপনে শানানো হ'তে থাকে অন্য ধার্মিককে জবাই করার ছুরিকা।**

**-হুমায়ূন আজাদ**

**অঙ্গ / দেহদানে** ইচ্ছুক হলে লিংকে ক্লিক করে ফ্রম ফিল আপ করে ফেলুন-
NOTTO : National Organ & Tissue Transplant Organisation

কেউ মারা গেলে বডি দান করতে নিয়ে যান নিকটবর্তী সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।
অঙ্গ / দেহদান করুন, বেঁচে থাকুন অনেকের মাঝে।
আর উৎসব হোক **রক্তদান**। যোগাযোগ করুন, যে কোনও হাসপাতাল বা রক্তদান শিবিরে।

**।। পত্রিকা পড়ুন, লিখুন, নতুন চেতনা ছড়িয়ে দিন সকলের মাঝে ।।**

**চেতনা** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ **ডিসেম্বর সংখ্যার** জন্য লেখা পাঠান ২০ তারিখের মধ্যে নীচের ইমেল আইডিতে --
yuktibadira@gmail.com
পত্রিকার গ্রাহক হতে চাইলে, নাম, পরিচয় জানিয়ে মেল করুন চটপট।।

**চেতনা'র অন্বেষণে**

**যুক্তির পথে আমরা**